গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ১৯ - ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

কমরেড নীহার মুখার্জীর অবস্থা গভীর সংকটজনক

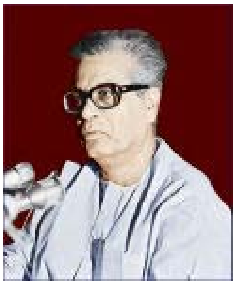

প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। গণদাবীর গত সংখ্যায় তাঁর অসুস্থতা ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বশেষ ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, কমরেড নীহার মুখার্জীর চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ড ১১ ফেব্রুয়ারির মেডিকেল বুলেটিনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি আরেকটি বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বুলেটিনে বলা হয়েছে, প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কে বি বক্সির পরিচালনায় মেডিকেল বোর্ড ১৩ ফেব্রুয়ারি কমরেড নীহার মুখার্জীর শারীরিক অবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা করে দেখেছে বর্তমানে তিনি সেপসিস ও মাল্টিপল অরগ্যান ডিসফাংশান সিনড্রোমে ভুগছেন।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, পালমোনলজিস্ট ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ প্রতীক দাসের মতো প্রখ্যাত চিকিৎসকদের নিরন্তর পরামর্শ ও নির্দেশ নেওয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ সুকুমার মুখার্জী এবং প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডাঃ সীতেশ দাশগুপ্ত ১৪ ফেব্রুয়ারি কমরেড নীহার মুখার্জীকে পরীক্ষা করে বলেছেন, সামগ্রিক ভাবে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। এই অবস্থায় দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে কর্মরত যে সব প্রখ্যাত ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ইতিপূর্বে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের আবার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। মেডিকেল বোর্ডের অভিমত অনুযায়ী কমরেড নীহার মুখার্জীর সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে এবং তা গভীর সঙ্কটজনক।

মূল্যবৃদ্ধি রোধে

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন নামক প্রহসন

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে দিল্লিতে ব্যাপক প্রচার তুলে ও মহা সমারোহে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক হয়ে গেল। কথায় আছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আওয়াজ যত তোলা হল, ফলাফল তার ভগ্নাংশও নয়। অনেকে হয়তো আশা করেছিলেন, বৈঠক থেকে মন্ত্রীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মূল্যবৃদ্ধি রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ঘোষণা করবেন। কিন্তু 'ইহা করিতে হইবে', 'উহা করিতে হইবে' এবং প্রধানমন্ত্রীর 'আমরা মূল্যবৃদ্ধির কঠিন সময়ে পার হয়ে এসেছি' ইত্যাদি কিছু অকার্যকরী কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। সাথে সাথে, কোনও বিষয়কে ধামাচাপা দেওয়ার পুরানো কৌশলের পুনরাবৃত্তি করে কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে একটি 'স্ট্যান্ডিং কোর গ্রুপ' গড়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। এই গ্রুপ নাকি মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে। যেন পরামর্শের অভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি এতদিন মূল্যবৃদ্ধি রোধে কিছু করতে পারছিল না।

বৈঠকে রাজ্যের 'বামপন্থী' মুখ্যমন্ত্রী নাকি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খুব জোরালো ভাষণ দিয়েছেন। স্বভাবতই এই প্রশ্নে তার নিজের রাজ্য সরকার যে চরম অপদার্থতা দেখিয়েছে, সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

তিনের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সরকারি ব্যর্থতার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারিআসামের শিলচরে বিক্ষোভ

২১শের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

খালেকুজ্জামান

২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে একটি লেখা দেওয়ার জন্য গণদাবীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এই লেখাটি পাঠিয়েছেন।

১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন জাতিরাষ্ট্র হিসাবে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার উন্মেষ হয়েছিল ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেদিনের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব এখন বাংলাদেশের জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপৃত হচ্ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও পালিত হচ্ছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই ভিন্ন মাত্রায় এই আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হলে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনেকটা একমত হয়েছিলেন যে, হিন্দিই হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা। অন্যদিকে মুসলিমের লিগের অবাঙালি নেতৃত্ব পাকিস্তান হলে তার জন্য উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেন।

বঙ্গদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী ১২০৪ সালে মুসলিম শাসন শুরুর কাল থেকে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পূর্বপুরুষদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি পালন করা সহ বাংলা ভাষাতেই কথা বলতেন। অবাঙালি ও অভিজাত মুসলিমদের মধ্যে আরবি-ফার্সি ভাষার চল ছিল এবং তারা নিজেদের আরব-ইরান বংশোদ্ভূত বলে মনে করতেন। উর্দুভাষী মুসলিমদের অধিকাংশ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বাস করতেন। পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে এদের প্রভাব তেমন ছিল না। ১৯০৯ সালে বাসনা পত্রিকায় হামেদ আলি লিখেছিলেন, ''আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব-পারস্য-আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা। ... যে দেশে আমরা সাত শত বৎসরকাল বাস করিতেছি, সে দেশকে যদি আমরা এখনও স্বদেশ জ্ঞান না করি — তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য এবং পরিতাপের বিষয় আর কী আছে?'' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠী শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যায় এবং তাদের তৈরি আধুনিক ভাষা সাহিত্যের সাথে মুসলিম বাঙালি জনগোষ্ঠী তেমন সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারেনি। আবার অভিজাত (আশরাফ) দাবিদার উর্দু-ফার্সিভাষী মুসলিমদের সাথেও নিম্ন বর্ণের (আতরাফ) সাধারণ মুসলিম জনগণের একক সমাজও গড়ে ওঠেনি। এক পর্যায়ে বাংলাভাষী মুসলমানরা যখন শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে আসতে শুরু করেন, তখন ধর্মীয় শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে উর্দু-ফার্সি-আরবি শিক্ষাকেও অনেকে অপরিহার্য মনে করতে শুরু করেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের বঞ্চিত রেখেই চটকলে চুক্তি করা হল

অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক এবং বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''সরকারি উদাসীনতা, চটকল মালিকদের ঔদ্ধত্য এবং আন্দোলন ভাঙার সমস্ত অপচেষ্টাকে উপেক্ষা করে এই রাজ্যের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক তাদের আইনসঙ্গত অধিকার ও দাবিগুলির সমর্থনে দীর্ঘ ৬১ দিন ধরে যে বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট চালিয়ে গেলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই আইনসঙ্গত দাবিগুলির সুষ্ঠু মীমাংসা হল না — এবারের চুক্তিতেও শ্রমিকরা বঞ্চিতই থেকে গেলেন। ২০০৭ সাল থেকে ক্রমাগত বর্ধিত ডি এ না দিয়ে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকপিছু ৪০ হাজার টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করল। বর্তমান পরিস্থিতিতে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার কৃতিত্ব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও ধর্মঘটরত আড়াই লক্ষ শ্রমিকের। আমরা এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ যে চুক্তি হল, তাতে নতুন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি যেখানে ২০০২ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী দৈনিক ২২০ টাকা হওয়ার কথা এবং যা শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল, তা মানা হল না— এবার আর একবার কমিয়ে ২২০ টাকা থেকে মাত্র ১৫৭ টাকা করা হল। এই কমানোর ক্ষেত্রে কোনও যুক্তি এবং সুবিচার রইল না — একমাত্র মালিকদের 'ইচ্ছা'কেই সরকারি সীলমোহর দেওয়া হল।

আশ্চর্যের বিষয়, ২০০২ সালের চুক্তিতে উৎপাদনভিত্তিক বেতনের নামে শ্রমিকের পয়সা কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু চুক্তির এই ধারাটি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক বর্জন করেছিল এবং গত ৮ বছর যাবৎ মালিকরা এটা চালু করতে পারেনি। সেই কুখ্যাত 'উৎপাদনভিত্তিক বেতন'কেই জারি রাখা হল। উল্লেখ্য যে এই বিষয়টি কুড়িটি ইউনিয়নের দাবিপত্রে ছিল না।

সাতের পাতায় দেখুন

২১শের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

একের পাতার পর

ব্রিটিশ শাসকদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ‘ভাগ করো শাসন করো’ নীতি বাস্তবায়ন পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা মুসলিম মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বাংলাভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বা কাফেরের ভাষা বলে ফতোয়া দেওয়া শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ বাংলাভাষী মানুষ ও ক্রমাগত শিক্ষিত হয়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর মাঝে তা তেমন আবেদন তৈরি করেনি। ১৯৪৭ সালে ইত্তেহাদ পত্রিকায় আবদুল হক লেখেন, “ যাঁরা বলেন যে, বাংলা হিন্দুর ভাষা এবং পৌত্তলিকতার ভাষা, মুসলমানদের ভাষা নয়, তাঁরা কেউ ওই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন না। বাংলা ভাষার চর্চা করা গোঁড়া ব্রাহ্মণ রৌরব নরকের পথ প্রশস্ত করার উপায় বলে বর্ণনা করেছিলেন, সেদিন মুসলিম শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলাভাষার সমৃদ্ধি এবং সম্মানের স্থান লাভ সম্ভব হয়েছিল। বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন নয়; ... সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বলেই যদি বাংলা মুসলমানদের ভাষা না হয়ে হিন্দুদের ভাষা হয়, তবে দুনিয়ার কোনও মুসলমানকেই মুসলমান বলা চলে না, কেন না, এমন এক দিন ছিল, যেদিন তাদের কোনও পূর্বপুরুষই মুসলমান ছিল না। ১৯০৩ সালে নবনূর পত্রিকায় লেখা হয়, ‘বঙ্গভাষা ব্যতীত মুসলমানদের মাতৃভাষা আর কি হতে পারে? যাহারা জোর করিয়া উর্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানদের ামতৃভাষার আসন প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতে মুসলমানদের একই মাতৃভাষা করিতে চান, তাহারা কেবল অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করেন মাত্র’।

অন্য ধরনের প্রবণতাও সে সময় লক্ষ করা গিয়েছিল। একদল সংস্কৃত ভাষার কাঠামোর মধ্যে বাংলা ভাষাকে বন্দি করে রাখার এবং অন্য দল অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অকারণে উর্দু-আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার মূল কাঠামোকেই পরিবর্তিত করার পক্ষপাতি ছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম চৌধুরী বুলবুল পত্রিকায় লেখেন, “... একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে তোলবার প্রস্তাব করতেন। যদি তাঁদের অনুরূপ কোনও সম্প্রদায় মুসলমান সমাজেও থাকে তাহলে বীরবলের একটি পুরনো কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিই। বীরবল বলেছিলেন, “এ দোটানায় পড়ে বেচারা বঙ্গ সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই স্থির করতে না পারে চলৎশক্তিরহিত হবেন।” একই কাগজে মিজানুর রহমান লিখেছেন, “.. মুসলমান সমাজের ওভার এনথ্যুসিয়াস্ট একদল বলেছেন, ‘ চালাও মুসলমানি শব্দ ও ভাবের বন্যা’। ‘কলেমা’ পড়িয়ে বাংলা ভাষাকে করে ফেল পুরোদস্তুর মুসলমান।” তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রগতিবিরোধী একদল বলছেন, “মুসলমানি শব্দের আবর্জনায় বাংলা ভাষাটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ করতে হবে।” সুখের বিষয় এই উগ্রপন্থী উভয় দলের সংখ্যা খুব বেশি নয়।” এই ভাবেই ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা-বিতর্ক চলেছিল।

তারপর ’৪০-এর দশকে এসে হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হানাহানিতে বাংলা-পাঞ্জাবকে খণ্ডিত করে ভারত-পাকিস্তান নামক তথাকথিত দুই জাতির রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। ১৯৪০ সালে শেরে-বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সমূহ স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ মিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় পাকিস্তান প্রস্তাব মার খেয়ে ১২০০ মাইলের দূরত্বে পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) ও পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) নিয়ে পাকিস্তান গঠনের নকশা চূড়ান্ত রূপ নিতে থাকার পর্বে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে, অর্থাৎ দেশভাগের এক মাস পূর্বে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পরে অভিমত দেন। এর জবাবে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষা বিশেষজ্ঞ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ... ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন — পুস্তু, বেলুচি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং বাংলা ; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলেই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। ... যদি বিদেশি ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।

কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, “বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ, ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তা হলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হওয়ার আশংকা আছে।”

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণের জীবনের ঘনীভূত হতে শুরু করল অস্তিত্বের নতুন সংকট। পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী হয়ে গেলেন ভারতীয় জাতির অন্তর্গত। অর্থাৎ তারা ভারতীয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি জনগোষ্ঠী হলেন পাকিস্তানি। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী হয়ে রইলেন, না পাকিস্তানি, না ভারতীয়। কারণ একটি জাতি গঠনের জন্য যে সকল উপাদান ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয়, তার কোনওটাই ভারতকে মাঝখানে রেখে ১২০০ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল না। ভৌগোলিক দূরত্ব সহ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল কিছুই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। একমাত্র ধর্মের বন্ধনে জাতি গঠন যে অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলাদা জাতির অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও গুরুত্ব দেয়নি পাকিস্তানী শাসকেরা। আসলে ‘এক জাতি এক রাষ্ট্রে’র নামে পূর্ব পাকিস্তান বাস্তবে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু পুঁজিপতিদের তুলনায় পিছিয়ে থাকা মুসলিম যে ধনিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তারা সবাই ছিল মূলত অবাঙালি এবং পশ্চিম পাকিস্তান ছিল তাদের আবাসভূমি, আর পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়েছিল তাদের শোষণের লীলাভূমি। এই পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে শুরু থেকেই ভয়ে ছিল, কখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় ৫৪ ভাগ বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গণতান্ত্রিক চেতনায় জেগে ওঠে এবং পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ভিত্তিমূলে আঘাত করে বসে। অতীতের রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের সঙ্গে এই বিষয়টিও এসে যুক্ত হয়ে গেল।

পাকিস্তান আন্দোলনের চরম মুহূর্তে আসাম-বাংলা কেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম নেতৃত্ব পিছু হঠে গিয়েছিল এবং অবাঙালি নেতৃত্বের প্রাধান্যের পাশাপাশি মহম্মদ আলি জিন্নার ভাবমূর্তিকে পাকিস্তানে অবিসংবাদিত করে তোলা হয়েছিল। জিন্নার আকাশছোঁয়া ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই চেয়েছিল, বাঙালি এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিয়ে এখানকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্কুরিত জাতিচেতনা বোধকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এ বিষয়টি সামনে চলে আসে; কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মাথায় ১৭ নভেম্বর ১৯৪৭, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক কবি শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ, আইনজীবী, অধ্যাপক, ওলামা, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, মহিলা সহ শত শত নাগরিকের স্বাক্ষর করা বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি স্মারকপত্র পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজেমুদ্দিনের নিকট পেশ করা হয়। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল, বাংলাভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ভাষা এবং বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় ৮ কোটি লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়া ইহাকে বর্তমান উন্নত স্তরে উন্নীত করিয়াছে।

বাংলাভাষী গণপরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষরও এর মধ্যে ছিল বলে জানা যায়। এর পরপরই ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের প্ররোচনায় কিছু লোককে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার দাবি প্রচার করার কাজে ঢাকায় নামানো হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যাপক গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং সে প্রচারকার্য থেমে যায়। তবে জনমনে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ নেমে আসার একটা শংকা জেগে উঠতে শুরু করে। কারণ এ ঘটনার পরপরই সরকারি প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়েছিল, “ ... এ পর্যন্ত যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাই বোঝা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের শত্রুরাই উস্কানি দিয়েছে, কারণ ইহারা এদেশের মুছলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট” (দৈনিক আজাদ, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭) । শুধু তাই নয়, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ ভারত থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার, ইত্তেহাদ ও স্বাধীনতা পত্রিকা ১৫ দিনের জন্য পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকারি আদেশ জারি হয়।

১৯৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গণপরিষদে ইংরেজি এবং উর্দুতে বক্তৃতা করার রীতি চালু ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখার বিধানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই প্রস্তাবের পিছনে ভারতের সাথে আঁতাত ও ষড়যন্ত্র আছে এমন ইঙ্গিত লিয়াকত আলি খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একভাবে প্রকাশ পায়। পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ববঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ভাষা প্রশ্নে ব্যাপক গণবিক্ষোভকে আপাতত চাপা দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নাজেমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিনের সাথে ১৫ মার্চ ৮ দফা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন।

তারপরই ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সভায় ঘোষণা দেন যে, “... এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনও ভাষা নয়। যদি আপনাদের কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তবে সে হবে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনও জাতিই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও টিকে থাকতে পারে না। ... সুতরাং রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।” ময়দানে শত শত ছাত্র জনতা না-না শব্দে প্রতিবাদ জানায়। ২ দিন পর ২৪ মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন ভাষণে পুনরায় তিনি বলেন, “কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রভাষাই থাকতে পারে। যদি এই রাষ্ট্রের গঠনকারী অংশসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সেই ভাষা আমার মতে কেবল উর্দুই হতে পারে।” সেখানে কয়েকজন ছাত্র প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ময়মনসিংহের জনসভায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিরোধিতাকারীদের শত্রুপক্ষীয় চর উল্লেখ করে রাষ্ট্রবিরোধী আচরণে বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। সেই বছর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হয়। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৪০ জনেরও বেশি সদস্য নিয়ে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে এবং পুলিশ গুলি চালায়। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে জব্বার, রফিক, সালাম, বরকতসহ প্রায় ৮ জন শহিদী মৃত্যুবরণ করে। এ শহীদদের মধ্যে একদিকে যেমন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিলেন তেমনি ছিলেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও। সরকারের এ বর্বরতার প্রতিবাদে সারা দেশে প্রতিবাদের এবং প্রতিরোধের প্লাবন বয়ে যায়। ভাষার এই আন্দোলনের মধ্য থেকেই পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন জাতি চেতনা গড়ে ওঠে। বাঙালি, চাকমা, মারমা, সাঁওতালসহ ২৯/৩০টি জাতিসত্তার মিলিত লড়াইয়ে প্রায় ৯৯.৯ শতাংশ বাঙালি জাতিসত্তার নামেই বাঙালি জাতি পরিচিতি লাভ করে এবং তা পরিণতি পায় ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলন ধর্মীয় জিগিরে গড়ে ওঠা ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি ভাবনার ঘোর কাটিয়ে একটা সেক্যুলার তথা ইহজাগতিক চেতনারও ভিত্তি গড়ে দেয় যা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব ধর্মের মানুষকে এক জাতীয় চেতনায় এনে দাঁড় করায়। তার একটা নমুনা দেখতে পাই ভাষা শহিদদের স্মরণে গড়ে ওঠা শহিদ মিনার ও প্রভাতফেরির মাঝে। ২১ ফেব্রুয়ারির পর ২২ ফেব্রুয়ারি রাতেই প্রথমে রাজশাহি কলেজে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা গড়ে তোলেন শহিদ মিনার যা ধীরে ধীরে ধর্ম-মত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ধর্ম-মত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার এ রীতি ইসলাম ধর্মে চালু নেই। ভাষা শহিদদের ঘিরে চালু হওয়া প্রভাতফেরি হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক ইহজাগতিক স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের এক সার্বজনীন পদ্ধতি। পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের দোসর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ পথ থেকে ফেরাতে পারেনি। যদিও স্বাধীনতাউত্তর ৩৯ বছরের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন-শোষণে সে দিনের গড়ে ওঠা বলিষ্ঠ উপনিবেশবিরোধী ইহজাগতিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

পার্শ্বশিক্ষকদের অনশন আন্দোলন

এ রাজ্যে প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (V - VIII) কর্মরত ৫৫,৭৫৩ জন পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত বঞ্চনা এবং অবমাননার শিকার হয়ে চলেছেন। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' সুনিশ্চিত করার কথা বলে ২০০৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে এই শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আজও তাঁদের স্থায়ীকরণ করা হয়নি। বহু আন্দোলনের পর তাঁদের বেতন প্রাথমিকে ৪০০০ টাকা এবং উচ্চ-প্রাথমিকে ৫৫০০ টাকা হয়েছে। আইনানুযায়ী যে কোনও কর্মীর নিয়োগের ৫ বছরের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করার নিয়ম থাকলেও পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সে অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা চাকরির স্থায়ীকরণ, সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নির্ধারণ, পি-এফ প্রকল্প চালু করা প্রভৃতি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অনশন আন্দোলন শুরু করেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধিও সমস্যা সমাধানে অনশনস্থলে আলোচনার জন্য আসেননি। অনশনের ফলে একের পর এক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে ক্ষোভে ১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের চিকিৎসাতেও গাফিলতি হয়েছে বলে নেতৃবৃন্দ জানান। অনশনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি এই নিস্পৃহতা শুধু রাজ্য সরকারের জনবিরোধী চরিত্রকেই প্রকট করে তা নয়, সরকারে আসীন নেতা-মন্ত্রীরা কত হৃদয়হীন তাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

সরকার জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিলে পার্শ্বশিক্ষকদের স্থায়ীকরণে বাধা কোথায়? এই শিক্ষকরা কি অযোগ্য? তাহলে সরকার তাঁদের নিয়োগ করেছে কেন? এই শিক্ষকরা যাতে মানসিক সুস্থিতি নিয়ে ভালভাবে পড়াতে পারেন তার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয় কি? তার জন্য দরকার স্থায়ীকরণ, বাঁচার মতো মজুরি নির্ধারণ এবং অবসরের পর পেনশন। তা ছাড়া এই শিক্ষকদের চাকরির নবীকরণও অপমানজনক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অর্থ দিয়ে বা অনৈতিক উপায়ে পরিতুষ্ট করতে না পারলে, বা শিক্ষকরা কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক বিরোধী হলে নবীকরণ বহু ক্ষেত্রে আটকে যায়, নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। এই সমস্যা কি সমাধান করা যায় না? রাজস্থান ও ওড়িশা সরকার যদি ধাপে ধাপে বহু পার্শ্বশিক্ষককে স্থায়ীকরণ করতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা করতে পারবে না কেন? সরকার অজুহাত দিচ্ছে স্কুলসার্ভিস কমিশনের জন্য নাকি কর্মরত এই শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ করা যাচ্ছে না। প্রাইমারি স্কুলে এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ হয় না। তাহলে সেখানে এসএসসি কী করে বাধা হয়? উচ্চপ্রাথমিকে বা হাইস্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগে এসএসসি বাধা হলে কর্মরত শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কীভাবে তাদের নিয়োগ করা যায় তার পথ সরকারকেই বের করতে হবে।

রাজ্য পার্শ্বশিক্ষক সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামিম আখতার বলেন, ''সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটা স্থায়ী ধরনের কাজ। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শিক্ষক থাকবে কেন?'' তিনি বলেন, 'স্থায়ীকরণের দাবিতে আমরা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

এই অনশনে শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল এবং সেভ এডুকেশন কমিটি, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস, বিপিটিএ, এসটিইএ প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কলেজ স্কোয়ারে অনশনরত পার্শ্বশিক্ষকরা

বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের সিডি

১) যুব সম্মেলনে ভাষণ, ১৯৭৫

২) ছাত্র সম্মেলন, কটক, ১৯৭৪

৩) ২৪ শে এপ্রিলের ভাষণ — ১৯৬৮, ১৯৭৩, ১৯৭৫

৪) ১৫ই আগস্ট, ১৯৭০

৫) কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে-১৯৭৪

৬) চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ২৭ অক্টোবর, ১৯৬৭

৭) কলকাতায় ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

৮) যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক, ৩০ জুলাই, ১৯৬৯

৯) চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে, ২৬ আগস্ট, ১৯৬৮

১০) চীনের নবম ও দশম কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা, ১৯৭৩

১১) নভেম্বর বিপ্লব, ১৯৭১

১২) ঝরিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ভাষণ, ১৯৬৯

পাওয়া যাচ্ছে ঃ

পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

প্রতি সিডির দাম ২৫ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন নামক প্রহসন

একের পাতার পর

নীরব ছিলেন। না হলে রাজ্য জুড়ে কালোবাজারি আর মজুতদাররা এমন দাপিয়ে বেড়ায় কী করে? তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে? রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন শিথিল করার অভিযোগ এনেছে। সঠিক অভিযোগ। কিন্তু মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি কি পর্যাপ্ত আইনের অভাবে, নাকি তাদের সাথে শাসক সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীদের দহরম-মহরম এবং পারস্পরিক লেনদেনের সম্পর্কই তাদের চুপ থাকতে বাধ্য করেছে? সারের খুচরো দাম তো কেন্দ্রীয় সরকার বেঁধে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যে সার নিয়ে অবাধে কালোবাজারি চলছে কী করে? ৩০০ টাকা বস্তার ইউরিয়া ৭০০-৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে কী করে? এটা কি রাজ্য সরকার আটকাতে পারত না? প্রতিদিন অসংখ্য নিরীহ নির্দোষ মানুষকে নানা মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। তারা বিনা বিচারে দীর্ঘ দিন জেলে পড়ে থাকছে। অথচ একজন কালোবাজারি মজুতদারকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকালো না কেন? মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামে গরিব চাষিদের আন্দোলন দমন করতে গলার শির ফুলিয়ে বলেছিলেন, কেমিকেল হাব আমরা করবই, দেখব কে আমাদের আটকায়! কই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে তিনি তো তেমন কোনও হুঙ্কার দিলেন না যে, কালোবাজারি, মজুতদারি আমরা রোধ করবই, দেখি কে আমাদের আটকায়!

লালগড়ে গরিব, নিরন্ন মানুষের বাঁচার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে দমন করতে কংগ্রেস-সিপিএম সমঝোতার অভাব হয়নি। কই, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তো তেমন ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনও যৌথ অভিযানের ডাক দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী! গণআন্দোলন দমনে কোনও সরকারেরই পুলিশ-মিলিটারির অভাব হয় না, মজুতদারি রুখতে তারা সেই পুলিশ-মিলিটারিকে কাজে লাগায় না কেন?

যে গণবণ্টন ব্যবস্থা দরিদ্র-নিম্নবিত্ত মানুষকে মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই দিতে পারত, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উদার অর্থনীতির নামে সেটিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে এনেছে। কিন্তু যে ব্যবস্থাটুকু এখনও টিকে রয়েছে তার সুযোগ থেকেও রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে কেন? পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গণবণ্টনে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ চাল-গমের বেশিরভাগটাই রাজ্য সরকার তোলেনি। তার ফলে বরাদ্দ ক্রমাগত ছাঁটাই হয়েছে। ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাল বরাদ্দ ছিল ৩১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন, রাজ্য নিয়েছিল মাত্র ৯০ হাজার টন। ফলে ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে চালের বরাদ্দ ছেঁটে দাঁড়িয়েছে ১৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টন। গমও বরাদ্দ মতো না তোলায় ২০০৫-০৬ আর্থিক বছরের বরাদ্দ ২৯ লক্ষ ৪১ হাজার টন থেকে ২০০৮-০৯-এ কমে দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টন। এরপরও কি বলা যায়, গণবণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সিপিএম নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতাদের থেকে কোনও অংশে আলাদা?

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদার-আর্থিক নীতি, অপরদিকে রাজ্য সরকারের মতো তাদেরও মজুতদার-কালোবাজারিদের প্রতি নরম মনোভাবই মুল্যবৃদ্ধি এমন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা একের পর এক বৈঠক করে দেশবাসীকে 'অবিলম্বেই মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে' বলে বিবৃতি দিচ্ছেন, অপরদিকে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, শারদ পাওয়ার বলে চলেছেন, চিনির দাম আরও বাড়বে, জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়বে। মন্ত্রীর এই আগাম বিবৃতি কি মজুতদার, কালোবাজারি, মিলমালিকদেরই দাম বাড়াতে উৎসাহিত করল না? স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি আগাম দাম বাড়ার কথা বলতে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষ দাম কমানোর জন্য কার কাছে দাবি জানাবে! মহারাষ্ট্রের চিনি মিলের মালিকদের সঙ্গে তাঁর স্বার্থের সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে। এর পরেও তাঁকে মন্ত্রীত্ব থেকে সরানো হবে না কেন?

বাস্তবে কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিশেষে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা আজ মজুতদার, বৃহৎ ব্যবসায়ী, মিল মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। নির্বাচনের বিপুল খরচ জোগাতে, বিলাস-বৈভবের জীবনযাপন করতে তাঁরা এদের উপরই নির্ভরশীল। তাই কোনও মা সন্তানদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে না পারার যন্ত্রণায় তাদের মুখে বিষ তুলে দিয়ে নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে, কোনও চাষি ন্যায্য দাম না পাওয়ায় চাষের খরচ তুলতে না পেরে ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মহত্যা করলে, সে খবর এঁদের হৃদয়ে এতটুকুও তরঙ্গ তোলে না। কিন্তু মহামন্দার কবলে পড়ে মালিক-পুঁজিপতিদের লাভের অঙ্কে এতটুকু টান পড়লে এই সমস্ত নেতা মন্ত্রীদের রাতের ঘুম চলে যায়। দেশের গরিব মানুষ খেতে পাক না পাক, মালিকদের লাভের থলি ভরিয়ে দিতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দেয় সরকার, আর গরিব মানুষের জন্য রেশনে, ওষুধে সামান্য কিছু টাকা দিতে হলেই টাকা থাকে না তাদের। মালিক-পুঁজিপতিদের সঙ্গে স্বার্থের বন্ধনে যুক্ত এই সমস্ত নেতা-মন্ত্রীদের উপায় নেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। এর নামই তো পুঁজিবাদ। পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখার জন্যই তো সরকার। দরিদ্র, নিরন্ন জনতার সেখানে স্থান কোথায়! তাই মূল্যবৃদ্ধি রোধের উপায় খোঁজার নামে তাঁরা ভণ্ডামি করছেন। শারদ পাওয়ারের দল তো দেশবাসীকে চিনি না খাওয়ারই পরামর্শ দিয়েছে। ছয়ের দশকে এ রাজ্যেও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা গরিব মানুষকে ভাত না খেয়ে কাঁচকলা খাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। শাসকদের চরিত্র সব যুগেই এক!

কোনও আবেদন-নিবেদনই এদের কানে পৌঁছাবে না, নিরন্ন শোষিত মানুষের, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-আন্দোলনই একমাত্র পারে মালিকদের দালাল এই সরকারগুলিকে জনতার জন্য কিছু করতে বাধ্য করতে। সেই বার্তাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আজ, আওয়াজ উঠছে 'জোট বাঁধো, তৈরি হও'। মানুষ ধরতে পারছে, লড়াই না করলে এদের থেকে এক কণাও কিছু পাওয়া যাবে না। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রায় লক্ষ মানুষের মহামিছিলের আওয়াজ যেন তারই জাগরণী। সেদিন মহামিছিলের মহাসমাবেশ বাকি মানুষদের ডেকে গেল — আর ঘুমিয়ে থাকা নয়, পিছিয়ে থাকা নয়, ওঠো, জাগো, এগিয়ে এসে উঁচুতে তুলে ধরো সংগ্রামের লাল নিশান।

মহান নেতার শিক্ষায় উন্নত বিপ্লবী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত — স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত গত ১২ জানুয়ারি ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি, কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি সভা আয়োজন করা হয়। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে কমরেড মানিক মুখার্জী এবং পলিটব্যুরো সদস্য কমরেডস রণজিৎ ধর, প্রভাস ঘোষ, মানিক মুখার্জী ও অসিত ভট্টাচার্য। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস্ ইয়াকুব পৈলান, দেবপ্রসাদ সরকার ও শংকর সাহা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

সকালের ওই সভায় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতিতে হল পূর্ণ হয়ে যায়, বাইরে বসার ব্যবস্থা করতে হয়।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভাপতি কমরেড রণজিৎ ধর কেন্দ্রীয় কমিটির শোক প্রস্তাব সভায় পড়ে শোনান। এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়।

সভাপতির ভাষণে কমরেড রণজিৎ ধর বলেন,

আমি অল্প দু'চার কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে রাখবার চেষ্টা করব। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত আমার থেকে দু'এক বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে 'তুমি' সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। পার্টির সুদীর্ঘ বছরের সংগ্রামে আমরা দীর্ঘদিন একত্রে থেকেছি, একত্রে কাটিয়েছি, একত্রে পার্টির কাজকর্ম করেছি।

একেবারে সেই গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় একটা নতুন পার্টি গঠনের অত্যন্ত কঠোর সংগ্রামের সেই দিনগুলিতে পুরোপুরি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে যাঁরা শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংগ্রামে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন, কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যাঁরা তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, মিশেছেন, কাজ করেছেন, সকলেই বলবেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ। কেউ তাঁকে নেতা বলে চিনিয়ে না দিলে, তিনি যে একজন নেতা, এটা মনেই হত না। খুব কঠিন তত্ত্বচর্চা করতেন তাও নয়, বিশাল জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, এও কেউ মনে করত না। খুব বড় মাপের একজন নেতা, এভাবেও তাঁর পরিচয় ছিল না। মানুষের সঙ্গে মিশতেন অতি সহজভাবে। যাঁরাই তাঁর সাথে একত্রে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন, অসংকোচে কমরেডরা যে কথা অন্যকে, এমনকী নিজের অতি প্রিয়জনকেও বলতে পারত না; অনায়াসে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তকে বলতে পারত। কখনও কাউকে ধমক দিচ্ছেন, তিরস্কার করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, কম্যান্ড করছেন, এ তাঁর চরিত্রে ছিল না। মানুষের সাথে, কমরেডদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে তাঁর এই যে গুণ, এটা সচরাচর মেলে না।

আর একটা জিনিস ছিল। জীবনে কী পেয়েছেন, কী পাননি, তার হিসাব কোনদিন করেননি। বিপ্লবী জীবনে চলার পথে যখন যেমন দলের নির্দেশে এসেছে সেইভাবে চলেছেন। কেউ তাঁকে সম্মান দিল কি দিল না, কী পেল কী পেল না, কেউ তাঁকে মানছে কী মানছে না — এ সমস্ত চিন্তা কোনওদিন তাঁর মনে স্থান পায়নি। তাই সকলেই, একেবারে খুব জুনিয়র কর্মীও অতি সহজে বন্ধুর মতো তাঁর সাথে মিশতে পারত।

শিল্পী হিসাবে তাঁর যে অসামান্য প্রতিভা ছিল — অনেকেই জানত না, বেশিরভাগ কমরেডরাও জানত না। খুব উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন শীতেশ দাশগুপ্ত। আমরা আজকাল রাজনৈতিক দলগুলির পোস্টারে নানা রকম অক্ষর বৈচিত্র্য দেখি, ডিজাইন দেখি, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, শীতেশ দাশগুপ্তই এর প্রচলন করেন। তাঁর তৈরি পোস্টারের মধ্যে শুধুমাত্র কতকগুলি শব্দ বা অক্ষর থাকত না, সে অক্ষরের মধ্য দিয়ে, ডিজাইনের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু প্রকাশিত হত, আকর্ষণীয় হত, শৈল্পিক সুষমাও থাকত। এই চর্চাটা সহজাত ছিল শীতেশ দাশগুপ্তর।

স্মরণসভায় মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড রণজিৎ ধর

আমার অভিজ্ঞতায় মনে আছে, আমি যখন প্রথম কালীঘাটে কর্পোরেশন ইলেকশনে লড়ি, তখন শীতেশ দাশগুপ্ত একটা পোস্টার করে দিয়েছিলেন। তার অক্ষরগুলি এবং ডিজাইন এত আকর্ষণীয় ছিল যে, সেটা সমস্ত এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বিরুদ্ধ দল প্রচার করেছিল যে প্রচুর টাকা-পয়সা খরচা করে এই পোস্টার করা হয়েছে এবং টাকা নিশ্চয়ই কোনও শিল্পপতি দিয়েছে। আসলে তা নয়। শীতেশের তুলির জোরেই পোস্টার অমন আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাঁর এই বিশেষ ক্ষমতার কথা অনেকে জানেন না। খুব ঘনিষ্ঠ এক আধজন জানেন। শীতেশ দাশগুপ্ত বহু নামকরা লেখকের বইয়ের প্রচ্ছদের লেটারিং এবং ডিজাইন করে দিতেন, কিন্তু নিজের নাম দিতেন না। তাঁর যে শিল্পী বন্ধুরা ছিল, যাঁদের এটা জীবিকা ছিল, শীতেশ দাশগুপ্ত তাঁদের হয়ে প্রচ্ছদ এঁকে দিতেন এবং চূড়ান্ত অভাবের সেই দিনগুলিতে এইভাবে পার্টির জন্য টাকা সংগ্রহ করতেন। কিন্তু এটাকে নিজে কোনওদিন প্রফেশন হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর সেই বন্ধুরাও পার্টির সমর্থক-দরদী ছিল। তাঁর কোমরে একটা ব্যথা ছিল। বহু পুরনো রোগ। সেই অসহ্য ব্যথা নিয়েও সামান্য একজন মজুরের মতো নিজের হাতে কাঠের ফ্রেম তৈরি করতেন, সিল্কস্ক্রীন প্রিন্টিং তখন চালু হয়েছে, সেগুলো করতেন দলের প্রয়োজনে। নিজের এই কথা কাউকে কোনওদিন বলতেন না, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শুধু জানত। সেই একেবারে গোড়ার যুগে, হাতে ধরে ধরে কর্মীদের তিনি পোস্টার লেখা শেখাতেন।

কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত দীর্ঘদিন বস্তির থেকেও অধম একটা ঘরে থেকেছেন বেহালায়। তাতে আলো-বাতাস ঢুকত না। একটা হাঁড়িতে রান্না হত, আবার তাতেই পোস্টারের আঠা তৈরি হত। কিন্তু এই নিয়ে তাঁর মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ, কোনও গর্ববোধ ছিল না। এটাই ছিল স্বাভাবিক জীবনযাপন। কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের মাটিতে একটা নতুন জাতের পার্টি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যার সদস্যরা হবে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ, যারা বুর্জোয়া মানবতাবাদী বিপ্লবের যুগে যে উন্নত চরিত্র তৈরি হয়েছিল, তার থেকেও উন্নত মানের হবে। শিবদাস ঘোষ ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি মানুষকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতেন। সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি যেমন সর্বহারাশ্রেণীর এই পার্টিকে কঠিন-কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে গড়ে দিয়ে গেছেন, তেমনি কিছু উন্নত মানের মানুষ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। আমরা এই ধরনের চরিত্রই চাই। বিপ্লব শুধুমাত্র কতকগুলো টেকনিক্যাল প্রয়োগের বিষয় নয়। বিপ্লব হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। একটা সমাজের এবং সেই সমাজের মানুষগুলির রুচি-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী —সমস্ত দিক থেকে পরিবর্তন। সেই মানুষগুলি হবে নতুন মানুষ, নতুন চরিত্রের, নতুন জাতের, নতুন সংস্কৃতি থাকবে তাদের মধ্যে। সেই উন্নত সংস্কৃতির ঝলক কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তের মধ্যে পাওয়া যাবে।

তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা এ কথা যেন মনে রাখি যে, দৈনন্দিন টেকনিক্যাল কাজে কর্মীদের আবদ্ধ থাকতেই হয়, কিন্তু পাশাপাশি কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন যে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত রেখে গেছেন, সেই চরিত্র আমাদের অর্জন করতে হবে, তা অর্জনের সংগ্রামে আমাদের সচেতনভাবে নিয়োজিত হতে হবে। এ কথা বলেই আমি কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তের প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কমরেডস, আমাদের স্মরণসভা শুরু করতে খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। যেটা আমরা করি না। তার কারণ, আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। আমাদের নির্ধারিত সভাপতি কমরেড রণজিৎ ধর সেখানে ছিলেন, সেখান থেকে আসতে কিছুটা দেরি হয়েছে।

কমরেড রণজিৎদা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কমরেড শীতেশদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর চরিত্রের অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করেছেন। আমরা প্রয়াত নেতা-কর্মীর স্মরণসভা যে আয়োজন করি, তা আনুষ্ঠানিক নয়। তাঁদের সংগ্রামী বিপ্লবী জীবনের ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করি যাতে তার থেকে মূল্যবান সম্পদ গ্রহণ করতে পারি, কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে গড়ে উঠতে ও এগিয়ে চলতে পারি।

আপনারা জানেন, আমাদের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, কোন সময়ে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত দলের সাথে যুক্ত হন। দলের সাথে যুক্ত হওয়া বললে ভুল হবে, দল গঠনের প্রক্রিয়ার সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে এই ধরনের একটি দল গঠনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়াও একটা মহৎ সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য। ওই সময়টা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি যখন দল গড়ার কাজ শুরু করেছি, অনেক বিরোধী পক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, উন্মাদ বলেছে। আর যারা আমার যুক্তির মূল্য দিয়েছিল, তারা বলেছিল, আপনার বক্তব্য ঠিক, যুক্তি ঠিক, কিন্তু এটা একটা অসম্ভব চেষ্টা। এতবড় একটা বিশাল দেশ, এত নামকরা নেতা, এত বড় বড় দল, আপনাকে কেউ চেনে না, জানে না; লোক নেই, টাকা নেই, প্রচার নেই। কোনও কিছুই নেই। ফলে আপনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আপনার জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে, আপনার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, আমি পারব কি পারব না, তা নিয়ে তর্ক করিনি। আমি শুধু একটি কথাই বলেছি, এ দেশের কোটি কোটি শোষিত মানুষের মুক্তির প্রয়োজনে যে সত্য আমি উপলব্ধি করেছি, আপনারা কি সেই সত্য আমাকে ত্যাগ করতে বলেন? আমি নিজেকে বিক্রি করতে পারব না, আমি নিজের বিবেককে বিসর্জন দিতে পারব না। আমি লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব। হয়তো আমার মৃত্যুর খবরও কেউ পাবে না, কিন্তু সত্য থাকলে ইতিহাস তার মূল্য দেবে। তাঁর এই আহ্বানে প্রথম যে সাত জন সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম যিনি, কমরেড নীহার মুখার্জী, আজ একমাত্র তিনিই জীবিত। বাকি ছয় জন প্রয়াত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী, কমরেড তাপস দত্ত ইতিপূর্বেই প্রয়াত হয়েছেন, আর সদ্যপ্রয়াত হলেন কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত। বাকি তিনজন কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, কমরেড অনিল সেন, কমরেড সনৎ দত্ত রোগশয্যায় শায়িত। এই স্তরে যাঁরা এসেছিলেন, কমরেড ঘোষ তাঁদের বলেছেন, তোমরা ধরে নাও বেশি কিছুই করতে পারব না। তবে এ লড়াইয়ে সত্য আছে, সঠিক পথ আছে, আদর্শ আছে। কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো কিছু করতে পারব না। এই কথা জেনে বুঝে যারা লড়তে চাও তারা এগিয়ে এস। যাদের মধ্যে এতটুকু দ্বিধা আছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, তারা সরে যাও। এই সময়ে কমরেড শীতেশদা কলকাতা আর্ট কলেজের একজন সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিবারও ছিল সম্পন্ন। এই সবকিছুকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা এবং বিপ্লবী দল গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার মধ্যে কত মূল্যবান সংগ্রাম, নিজেকে জয় করার সংগ্রাম, কত হাতছানিকে, তথাকথিত প্রলুব্ধকারী অকর্ষণকে উপেক্ষা করার সংগ্রাম যুক্ত, তার তাৎপর্য ও গভীরতাকে আমাদের বুঝতে হবে। আজ আমাদের দলে যুক্ত হওয়া অনেক সহজ। দল প্রতিষ্ঠিত, ঘরে ঘরে সুনাম, অল্প প্রচেষ্টায় ব্যাপক সমর্থন মেলে। আর সেদিনের কথা

পাঁচের পাতায় দেখুন

স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ

চারের পাতার পর

ভাবুন! তখন প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী দলগুলো আজকের মতো এতো পচে যায়নি। সে যুগটা আমরাও দেখেছি। এই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তখন কী প্রবল জনসমর্থন ছিল! তখন অধিকাংশ নেতা-কর্মী সৎ, সংগ্রামী, সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ওই দলের পিছনে তখন কাজ করছিল, মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে-তুংয়ের সমর্থন। অন্যান্য দল যেমন নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদী অনুশীলন দল তখন রূপান্তরিত হয়েছে আর এস পি-তে। রয়েছে আর সি পি আই পার্টি। এদের তখন কত শক্তি ছিল! বলশেভিক পার্টিকে আপনারা দেখেননি। বলশেভিক পার্টি তখন কলকাতায় হাজার হাজার ডক শ্রমিকের মিছিল করত। কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে, বামপন্থী দল হিসাবে এইসমস্ত দলগুলির বিরাট প্রভাব ছিল। এই সময় অখ্যাত, অজ্ঞাত, পরিচয়হীন একজন বিপ্লবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন দল গঠনের এই যজ্ঞে সামিল হওয়া কত কঠিন সংগ্রাম ছিল। আজ যে আমাদের পার্টি এই জায়গায় এসেছে, তার পিছনে সেই যুগের আরও অনেক কর্মী, যাঁরা হয়ত শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি, যে যতটুকু অবদান রেখেছেন, তার ভূমিকাও কম নয়। আর যাঁরা আজীবন, তখন থেকে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বহন করেছেন, সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁদের অবদান তো আরও অনেক বড়, অনেক মূল্যবান। যে জমিতে আজ আমরা কাজ করছি, দাঁড়িয়ে আছি, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষার ভিত্তিতে সেই জমিকে গড়ে তুলতে স্তরে স্তরে এঁদের সকলের অবদান আছে।

আমি নিজে শীতেশদার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা গণদাবীতে পড়েছেন, শোকপ্রস্তাবেও শুনলেন, ছবি প্রদর্শনীর কথা। সমাজ বিকাশের যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কমরেড স্ট্যালিন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ লেখায় করেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষেরও এই নিয়ে যে মূল্যবান বিশ্লেষণ আপনারা পড়ছেন, সেই বিশ্লেষণটাই ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন কমরেড তাপস দত্ত। আমি এই দলের সন্ধান পাই এই ছবি একজিবিশনের মাধ্যমে। আমি যখন তদানীন্তন পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় আসি, সে যুগের পরিবেশে অনেকের মতো আমার ক্ষেত্রেও স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব ছিল। রাজনৈতিক তত্ত্ব না বুঝেও প্রথমে আর এস পি, পরে সি পি আই-এর প্রভাবেই আমি গড়ে উঠেছিলাম। কলকাতায় এসে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না থাকা অবস্থায় আমি স্কুলে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম। সেই সময় আমি কিছু রাজনৈতিক বই সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আমার যে স্কুল ছিল, সেখানে এই একজিবিশন হয়। যতবার ভাবি সেদিনের সেই সন্ধ্যাবেলা প্রদর্শনী দেখার ছবি মনে ভেসে ওঠে, আর মনে হয়, এটা যদি আমার জীবনে না আসত, আমার জীবনটা ভিন্ন খাতে চলে যেত, আমি অন্ধকারে হারিয়ে যেতাম। প্রদর্শনী দেখে আকৃষ্ট হই। কারা করছে খুঁজতে গিয়ে শুনি ‘কালচার ক্লাব’। এই কালচার ক্লাবে তখন বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মহাযজ্ঞ চলছে। যার ঋত্বিক ছিলেন মহান মার্কসবাদী শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তখন দেশের দূরের কথা, এই শহরেরই বা কজন জানত, কমরেড শিবদাস ঘোষ কী মহান সাধনা করছিলেন সেখানে। এই কালচার ক্লাবকে ভিত্তি করে আমার যোগাযোগ। এই অর্থে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত, কমরেড তাপস দত্ত — এঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। কিছুদিন পর কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলী, এরাও দলের সাথে যুক্ত হয় ওই স্কুলের সংগঠন থেকেই।

আর একটা কথা আমি বলব। ১৯৫১ কি ৫২ সাল হবে, ঠিক সালটা মনে পড়ছে না, কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলন নিয়ে সভা। তখন সিপিআইয়ের বিরাট দাপট ও প্রভাব। কমরেড শিবদাস ঘোষকে মাত্র ২ মিনিটের জন্য বক্তৃতার সুযোগ দেওয়া হল। দুই মিনিটেই শান্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য কী, তা এমন ভাবে তিনি উপস্থিত করলেন, গোটা মিটিংঙে তার বিরাট প্রভাব পড়ল। আজও সেই বক্তব্য মনে পড়ে। এই সভার মঞ্চসজ্জায় কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তের ভূমিকা ছিল। আলোকশিল্পী তাপস সেনের নাম আপনারা জানেন। একসময় তিনি আমাদের দলের কর্মী ছিলেন। তখন অনেকের মতো আমারও থাকা-খাওয়ার সংস্থান ছিল না। তাপস সেনের দায়িত্ব ছিল আমার রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করার। কাজের জন্য তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আমি ঘুমিয়ে আছি একটা বেঞ্চিতে। সকালবেলা ঘুম ভাঙল, শীতেশদা আমাকে দেখলেন, তাপস সেন ছুটে এলেন। এটা বড় কথা নয়। মহম্মদ আলি পার্কে মঞ্চসজ্জায় শীতেশদার ভূমিকা ছিল আগেই বলেছি। শুনলাম তাপস সেন শীতেশদাকে বোঝাচ্ছেন, শীতেশ, তোমার এতবড় ক্ষমতা, পিকাসোর আঁকা বিশ্বখ্যাত পায়রার ছবি যা শান্তির প্রতীক, তা ব্যবহার করে তুমি মঞ্চ সাজিয়েছ। এই কাজ ছেড়ো না, শিল্পের কাজটা ভাল করে করো, নিজের জন্য না হোক, অর্থ রোজগার করে পার্টিকে সাহায্য করতে পারবে। কথাগুলো মনে আছে এইজন্য যে, আমার নিজের মধ্যেও তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, কাজ করছি পার্টির, আবার বাড়ি, অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, কিছুটা সাহিত্য চর্চার ঝোঁক ছিল, যা অনেকেরই থাকে, এ সব ভাবনা ছিল। শীতেশদা তাপস সেনকে উত্তর দিলেন, তাপসদা, আমি শিববাবুর ছাত্র হিসাবে বিপ্লবী আন্দোলনকেই শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছি। শিববাবুর কাছ থেকে বুঝেছি, গোটা সমাজের অন্যায়-অত্যাচার, নোংরা আবর্জনাকে মুক্ত করে সুন্দর শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার চেয়ে বড় শিল্পকর্ম আর কিছু নেই। এই উত্তরটা সেই সময় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

নানা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী তখন কলকাতা জেলা সম্পাদক। তিনি বোন-টিবিতে শয্যাশায়ী। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত তখন কলকাতা জেলা সংগঠনে কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীকে সাহায্য করতেন, মানে অ্যাকটিং সেক্রেটারি ছিলেন। বিভিন্ন ইউনিটে ঘুরতেন, কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন, আবার কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীকে জানাতেন, আলোচনা-পরামর্শ করতেন। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত আমাকে হাজরা অঞ্চলে কীভাবে বস্তিতে কাজ করতে হয় শিখিয়েছিলেন। বহু ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত ছিলেন, আপনারা শুনেছেন। বেহালাতে বিশেষভাবে দেখেছি। তখন ওখানে রাইস মিল ছিল, অধিকাংশ গরিব মহিলা শ্রমিক। দিনের পর দিন তাদের মধ্যে থেকে সংগঠন গড়ে তুলেছেন। বেহালাতে তাঁর নেতৃত্বে একসময় একটা পার্টির সেন্টার ওখানে তৈরি হয় কয়েকজন কমরেডকে নিয়ে। অধিকাংশ দিনই খাওয়া তখন জুটত না। সকলকে নিয়ে তিনি রাজনৈতিক আলোচনা, স্নেহ-মমতা-সৌজন্যের এমন একটা পরিবেশ করে রাখতেন, যেখানে দারিদ্রের ছায়াটা শুধু ছায়াই থাকত, দুঃখের ছায়াটা শুধু ছায়াই থাকত, কাউকে স্পর্শ করতে পারত না। তাঁর চরিত্রের একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল। অসুবিধা, বাধা, নানা সমস্যা, এগুলি মনের মধ্যে নানা রকমের বিরূপ প্রভাব ফেলত— এই অবস্থাতে তাঁর উপস্থিতি, তাঁর কথা, তাঁর আচরণ, তাঁর ব্যবহার, তাঁর চাহনি, সবটা মিলিয়ে একটা স্নিগ্ধতার প্রভাব পড়ত! খুব বেশি যে আলোচনা করতেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর সদাহাস্যময় উপস্থিতিই পরিবেশটাকে পাল্টে দিত। যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন, সকলেই এ কথা জানেন। পশ্চিমবাংলার কমরেডরা ১৯৮৮ সালের পর কমরেড শীতেশদাকে এখানে সক্রিয় ভাবে আর পায়নি। তার আগে থেকে যারা পার্টিতে আছে, তারা দেখেছে।

ওড়িশা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৯ ফেব্রুয়ারি কটকে অনুষ্ঠিত স্মরণসভা

আর একটা কথা বলব, যেটা রণজিৎদা একটা ভাষায় বলে গেছেন। দলে তিনি কোন কমিটিতে আছেন, কোন পদে আছেন, কী দায়িত্ব দেওয়া হল, কী গুরুত্ব দেওয়া হল, এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকা বলতে যা বোঝায়, তার জীবন্ত প্রতীক ছিলেন কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত। তাঁর যাঁরা বন্ধুস্থানীয় তাঁদের নেতৃত্বে তিনি কাজ করেছেন। শুধু কি তাই? আমি তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। পার্টিতে এসেছি অনেক পরে। পার্টি যখন আমাকে রাজ্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত রাজ্য কমিটির সদস্য নন। সে অবস্থাতেও তাঁকে দেখেছি। এ কথা আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তিনি যখন এ রাজ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সভাপতি, তখন সম্পাদক যিনি ছিলেন, নৈতিক কারণে দল তাকে কয়েক বছর আগে বহিষ্কার করেছে। দিনের পর দিন দেখেছি, কমরেড শংকর সাহা জানেন, রণজিৎ দা, মানিক মুখার্জীও জানেন, তৎকালীন ট্রেডইউনিয়ন সম্পাদক কী দুর্ব্যবহার করত! তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত! কিন্তু কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত কখনও তা গায়ে মাখেননি। তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এই নিয়ে কোনও দিন কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে অসুবিধা জানিয়েছেন, এটাও দেখিনি। আমি কোনও দিন দেখিনি শীতেশদা কোনও ব্যক্তিগত অসুবিধা বা কোনও সমস্যা বা অভিযোগ নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছে গেছেন। নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে গেছেন। আমাদের দলে পারস্পরিক আচরণ আমরা কখনও ঠিক করি, কখনও ভুল করি, কখনও কারও প্রতি দুর্ব্যবহার করি, কখনও অন্যায় অবিচারও করি। তাঁর ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। কিন্তু এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া, কোনও রেশ বা পাল্টা আঘাত করা, এটা তিনি করেননি। চরিত্রের এই দিকগুলো কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে এসেছে, যার তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দল যখনই যে কাজ দিয়েছে — ছোট বড়, গুরুত্বপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন, সব কাজ তিনি নিষ্ঠার সাথে করেছেন।

আমি সম্প্রতি ওড়িশার কমরেডদের নিয়ে বসেছিলাম। আমরা এ রাজ্যে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তকে পেয়েছি ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। তারপরের কর্মকাণ্ড ওড়িশায়। প্রায় ৬০ বছর বয়সে ওড়িশায় গেছেন। ওড়িশার গ্রাম-শহর সর্বত্র ঘুরেছেন। ওড়িয়া ভাষা বলতে শিখেছেন, ওড়িয়া বই পড়তে শিখছিলেন। ওড়িশার কমরেডরা বলেছেন, শীতেশদাকে আমরা নেতা নয়, বন্ধু মনে করতাম। বন্ধুরূপী নেতা হওয়া খুব কঠিন। একদিকে নেতা, আর একদিকে বন্ধু। আমরা আমাদের জীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষকে সেভাবে পেয়েছি। ওঁরা বলছেন, কমরেড শীতেশদাকে আমরা সব কথা বলতে পারতাম। তাঁর ভুলভ্রান্তি নিয়েও বলতে পারতাম। আমাদের কোনও অসুবিধা হত না। আরেকটা মূল্যবান কথা বলেছেন যে, আমরা জানতাম, তাপসদাকে দলে এনেছেন শীতেশদা। তাপসদা পার্টির সেক্রেটারি, শীতেশদা তাঁর নেতৃত্বে কাজ করছেন। তাপসদা তখন ওড়িশার পার্টি সেক্রেটারি, আবার ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তার চেয়ে বড় কথা, ঘাটশিলায় মহান নেতার মূর্তি নির্মাণে রত ছিলেন। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি ওড়িশার কাজে যেতে পারেননি। ফলে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তকে পাঠানো হয়েছিল। কমরেডরা বলছেন, শীতেশদা তাপসদার নেতৃত্বেই কাজ করছেন, এ কথা সবসময় আমাদের বলতেন। শীতেশদাও যে একজন নেতা, সে কথা কখনও বুঝতে দিতেন না। শীতেশদার এই চরিত্র এখানকার কমরেডরাও দেখেছেন। আত্মপ্রচার বলতে যা বোঝায়, শীতেশদার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না, কোনওদিনই না। এটা রণজিৎদা বলে গেছেন। শীতেশদার সমসাময়িক বন্ধুরা সব প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। আমরা অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতাম যে, আপনি প্রফেশনাল শিল্পী হবেন না বলে অন্যদের ছবি এঁকে দিচ্ছেন। শীতেশদা হাসতেন। বন্ধুদের অনুরোধে করে দিতেন। আর একটা হচ্ছে, যদি একবার নাম এসে যায়, পাবলিশার্সরা ডাকবে —এটা অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিলেন। আবার তাঁর ঐ বন্ধুরা চাঁদাপত্র দিয়েও পার্টিকে সাহায্য করতেন। শীতেশদাকে তাঁরাও খুব শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান খুবই গভীর ছিল। সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল। মিটিংয়ে খুব দীর্ঘক্ষণ বলতেন না, অল্প কথায় বলতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত আলোচনায়, গ্রুপ মিটিংয়ে কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তকে আরও অনেক জীবন্ত ভাবে পাওয়া যেত। পার্টি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট, কখনও কখনও কৃষক আন্দোলন, আবার গোড়ার যুগে শিল্পীদের সংগঠনও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পার্টির কাজের চাপের জন্য ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। আরও মহৎ শিল্পে তিনি সামিল হয়েছিলেন। আপনারা জানেন, কী সংবেদনশীল মন থাকার জন্য শেষ জীবনে, ওড়িশায় যে মহা সাইক্লোন হল, সেই মহাসাইক্লোনে হাজার হাজার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, শত শত মানুষ মারা গেল। আমাদের পার্টি রিলিফের কর্মসূচি নেয়। এ রাজ্য থেকে, অন্যান্য রাজ্য থেকেও আমরা ত্রাণ সংগ্রহ করেছি। এই রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য উনি নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দিন রাত পরিশ্রম করেছিলেন এই বয়সে। ওখানকার কমরেডরা নিরস্ত করতে পারেনি। একটা সময় গেছে, কয়েকদিন খাননি পর্যন্ত, ঘুমোননি। আর এত সব মৃত্যুর খবর চতুর্দিকে, দুর্দশার খবর। সরকারি নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য প্রবলভাবে তাঁর সংবেদনশীল মনকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত উন্নত বিপ্লবী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

পাঁচের পাতার পর

আলোড়িত ও বিচলিত করেছিল। এখান থেকে তাঁর স্নায়ুরোগ দেখা দেয়। যেটাই ক্রমাগত তাঁকে কঠিন ব্যাধির দিকে নিয়ে চলে যায়। কমরেড নীহার মুখার্জী তখন তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং নিজের কাছেই রাখেন।

এখানে আরও দুয়েকটা কথা আমি বলব। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত অসুস্থ অবস্থায়, আরোগ্যের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বসার ক্ষমতা, ওঠা-হাঁটার ক্ষমতা, স্নান-খাওয়া-শোয়া-বাথরুম কোনও কিছুই নিজে থেকে করতে পারতেন না। চিন্তার ক্ষমতা, মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা আস্তে আস্তে হারাতে থাকেন। কিন্তু কমরেড নীহার মুখার্জী গভীর আবেগে, ভালবাসায় তাঁকে নিজের পাশে রেখেছিলেন। এই সংবেদনশীলতা আমাদের দলের একটা সম্পদ। যুবক-তরুণ কর্মীদের কাছে আমি একথা বলতে চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির কথা বলতেন। প্রথমত আমাদের পার্টি একটা আলাদা জাতের পরিবার। এখানে শুধু কাজ দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয় — কমরেডশিপ, হৃদয়ভিত্তিক সম্পর্ক এর সম্পদ। সমাজের প্রতি যে গভীর ভালবাসা, শোষিত মানুষের প্রতি যে গভীর ভালবাসা, তারই মূর্ত প্রতীক পার্টির অভ্যন্তরে কমরেডদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক। আমি আগেও দেখেছি, কোনও কমরেড অসুস্থ, যে স্তরেরই কমরেড হোক না কেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ তাদের চিকিৎসা, তাদের সেবাযত্ন, যতটুকু সাধ্য করিয়েছেন এবং সাধারণ কমরেডদের দেখাশোনার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। আমরা তখন অখিল মিস্ত্রি লেনের সেন্টারে থাকি, একজন কর্মী নদীয়া থেকে যুক্ত হয়েছিল, পরে মুর্শিদাবাদে চলে যায়, সিপিআই থেকে এসেছিল, তার টিবি রোগ। অখিল মিস্ত্রি লেনে তাকে রাখার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন। সেখানকার কমরেডরা— গায়ত্রীদি, সাধনা, বকুল তার দেখাশোনা করত। আমি দেখেছি, বীরভূমে যুক্ত হওয়া, পরবর্তীকালে আসানসোলে পার্টির কাজের দায়িত্বে ছিল, কমরেড প্রিয়ব্রত মুখার্জী, তার ভাই, পার্টির সমর্থক, তার ক্যান্সার হয়েছে, কলকাতায় ট্রিটমেন্ট করাতে হবে, রাখার জায়গা নেই। তখন আমরা হাতিবাগান কমিউনে থাকি। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেখানে রাখার ব্যবস্থা করলেন। সেখানেও ওই বকুল চৌধুরী, সাধনা চৌধুরী, গায়ত্রী দাশগুপ্তা, তারা দিনের পর দিন নার্সিং করেছে। আর কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত তো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। কমরেড নীহার মুখার্জী বহু দিন শয্যাশায়ী, তাঁর নার্সিংয়ের জন্য কমরেড দরকার। মেদিনীপুর জেলা থেকে এল কমরেড বলরাম। কমরেড নীহার মুখার্জী বললেন, আমাকে নয়, শীতেশকে দেখুক। এই কমরেড বলরামও গত কয়েকটি বছর, দিন নাই, রাত নাই, যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মমতা নিয়ে নার্সিং করে গেছে অক্লান্তভাবে, সেটাও যারাই দেখেছে, তাদেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। আগামী দিনেও যেন পার্টিতে এটা বজায় থাকে। দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের প্রতি দরদবোধ, এটাও পার্টির একটা মূল্যবান সম্পদ।

কমরেড নীহার মুখার্জী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, আপনারা জানেন। তাঁরই আহ্বানে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই অবস্থাতেও তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি কংগ্রেসে যাবেন, হাঁটবার চেষ্টা করছেন, উঠবার চেষ্টা করছেন। আমরাও আশা করছিলাম তিনি যাবেন। এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অল্প অল্প জ্বর বাড়ছে, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। তারপর ক্রিটিকাল কন্ডিশন। কংগ্রেস চলাকালীন আমাদের কী অবস্থা! রণজিৎদা প্রথম দিনের অধিবেশনের ফার্স্ট সেশনের পর চলে এলেন কমরেড নীহার মুখার্জীর চিকিৎসা দেখাশোনা করার জন্য। কারণ, আমরা আলোচনা করে দেখলাম যে, তাঁর যাওয়া দরকার। আমাদের কিছু ডাক্তার, নার্স কমরেড কংগ্রেসে ডেলিগেট হয়েছিল, কিন্তু তারা যেতে পারেনি। আমরা যখন ডেলিগেট সেশনে বসে আছি মঞ্চে, আধঘন্টা, ৪০ মিনিট অন্তর ফোন করে খবর নিচ্ছি, একটি দিনের জন্য হলেও কমরেড নীহার মুখার্জী আসতে পারেন কি না, কিন্তু উনি পারেননি। কথা ছিল কংগ্রেসের পূর্বমুহূর্তে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিনি উপস্থিত থাকবেন ও কংগ্রেসের অধিবেশন তিনিই পরিচালনা করবেন। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায়, লিখিতভাবে তাঁর বক্তব্য ও মতামত পাঠান। আমরা তাঁর গাইডেন্স অনুযায়ীই কংগ্রেস পরিচালনা করি। মাঝরাতে তিনি ফোন করছেন প্রথমে মানিক মুখার্জীকে, তারপর আমাকে। রণজিৎদা দিল্লি যেতে পারছেন না, এ কথা শুনে তিনি বিরক্ত। আপনারা ভাবতে পারেন, ফোন করে আমাকে বলছেন 'রেড স্যালুট'। কী অবস্থা আমার তখন। আবার এখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। দিনগুলি কীভাবে যাচ্ছে আপনারা ভেবে দেখবেন। এই অবস্থাতেও হাসপাতালে থেকে তিনি কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত সম্পর্কে গণদাবীর লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিছু জায়গায় তিনি গাইড করে বলেছেন, এইভাবে লেখ। তাঁরই দেওয়া ভাষায় লেখা হয়,— 'কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত যে অব্যক্ত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, মৃত্যু তাঁকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল।' অ্যাকচুয়ালি শীতেশদা খুবই যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন। একেবারে কোনও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তা নয়, কিছু পারতেন, কিছু পারতেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি, আবার আমাদের পক্ষে দেখাও কষ্টকর ছিল। আমি দেখতে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকতাম না। বলতাম কেমন আছেন, তিনি হাসিমুখে বলতেন, ভালো আছি। কীরকম ভাল আছেন তো আমি জানি। কোনওদিন যন্ত্রণা বাইরে কখনও প্রকাশ করেননি, নীরবে সয়েছেন। বিভিন্ন নেতারা, বিভিন্ন কর্মীরা শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করে নানা দিক বিকশিত করেছেন, করছেন। সকলের গুণাবলী এক নয়, একই গুণও ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়, বিকশিত হয়। একই বাগানে যেমন নানা সৌরভের নানা ফুল থাকে, নেতা-কর্মীদের নানা গুণাবলীও তাই। আর এগুলিই আমরা আহরণ করি, সঞ্চয় করি।

আমি কমরেডদের বলব, পার্টি এখন বাড়ছে, আরও বাড়বে। আমাদের আটকাবার কারও ক্ষমতা নেই। অতীতেই যখন পারেনি, এখন আরও পারবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মহান হাতিয়ার আমাদের আছে। কালকের এতবড় মিছিল আপনারা দেখেছেন। আমি নিজে সম্প্রতি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম, অনুপ্রাণিত হয়েছি। সেখানে দেখেছি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে গ্রামের কৃষক, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক, ছাত্র-যুবক-মহিলা কীভাবে এগিয়ে আসছেন। অন্য রাজ্যেও যখন যাই, অনুপ্রাণিত হই। এ কতবড় শক্তি! মানুষকে মনুষ্যত্ব দিচ্ছে, চরিত্র দিচ্ছে, মহত্ব দিচ্ছে। আমার মনে পড়ে, মহান নেতার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দক্ষিণ ভারত থেকে আমি ঘুরে এসেছিলাম। আমার যাওয়ার দ্বিধা ছিল, ভাল ইংরেজি জানি না। শিববাবু হেসে বলেছিলেন, তুমি তো তবু কলেজ পর্যন্ত গেছ, আমি তো তাও যাইনি। ওখানে গিয়ে যতটুকু যা হয়েছে, খুবই আনন্দ হয়েছিল। শিববাবু অফিসে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কী করলে? আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনাকে যদি আরও ১০ বছর পাই, গোটা ভারতবর্ষ জয় করে ফেলব। একবার তাকালেন। কী সেই চাহনি, তার চরিত্রই আলাদা! বললেন, যা রেখে গেলাম, তোমরা পারবে না? তোমরা মানে আমরা সকলে। এই মহান নেতাই সিউড়ি ভাষণে বলেছিলেন, 'বয়স আমার বেশি হয়নি, শরীর ভেঙে গেছে।' জীবনে একবারই এ কথা বলেছিলেন। মিটিং-মিছিলে-আচরণে কমরেডদের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে ব্যথা পেয়েছিলেন। দু'টি মিটিংয়ে তাঁর চোখে জল দেখেছি। সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভায়, আর সিউড়ি যুব সম্মেলনে। সিউড়িতেই বলেছিলেন, ৪২ টি বছর ধরে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার জন্য আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। কত লোকে আমাকে কত ব্যঙ্গ করেছে। এস ইউ সি নাকি একটা পার্টিই নয়, ক্লাব। চামচিকেও পাখি, এস ইউ সি-ও পার্টি। আমি কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি। আর মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে সেন্ট্রাল কমিউনে গিয়েছিলাম, মাঝে মাঝে আমরা যেমন দেখতে যেতাম, দেখতে গেছি। আলোচনা হচ্ছিল লঘু ও গম্ভীর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আরও কিছু কমরেড ছিল। তাড়া দিচ্ছে কমিউনের কমরেডরা, শিববাবুর খাওয়ার টাইম চলে যাচ্ছে, অসুস্থ শরীর। আমরা তলার ঘরে অপেক্ষা করলাম। তাঁর খাওয়ার পর আবার ডেকে পাঠালেন, আলোচনা শুরু করলেন, শিববাবু চাইলে আমরা তো আর না করতে পারি না। সেদিন তাঁর শেষ কথাগুলো আজও বুকে বহন করছি। বলেছিলেন, আমি যা বলে গেলাম, বক্তৃতা দিয়ে গেলাম, সেগুলো শুনে আর আমার বইগুলো পড়ে তোমরা বক্তৃতা দিলে অনেক হাততালি পাবে। কিন্তু অন্তরের যে ব্যথা-বেদনার থেকে, যে স্বপ্ন নিয়ে আমি এ কথাগুলি বলেছি, সেই ব্যথা-বেদনার সাথে, সেই স্বপ্নের সাথে যদি তোমাদের হৃদয়ের সংযোগ না ঘটে, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হবে না।

কমরেডস, আমরা নানা কমিটির আজ নেতা বা দায়িত্বে আছি। কিন্তু আমাদের ভুলে যেতে হবে আমরা নেতা। আমরা একটা নীতি-আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করার সৈনিক মাত্র। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজন যেখানে যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেই দায়িত্বই সে পালন করবে। কমরেড নীহার মুখার্জী ডাক দিয়েছেন দ্বিতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে, জ্ঞানে-গুণে-চরিত্রে সমস্ত দিক থেকে যাতে আমরা নিজেদের ভেঙে গড়ে তুলতে পারি। বলেছেন, আমাদের জীবনে যেখানে যতটুকু ব্যক্তিবাদের প্রভাব আছে, আর্থিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হোক, প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে— যে ব্যক্তিবাদ আজকের যুগে ব্যক্তিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব করছে, ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দিচ্ছে, চরিত্রকে নষ্ট করছে, লড়তে হবে তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। এই মাপকাঠিতেই এবার স্তরে স্তরে কমিটি গঠনের চেষ্টা হয়েছে। কমরেড নীহার মুখার্জী কিছু কঠোর সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, আপনারা জানেন। আজ এ লড়াই সমস্ত ক্ষেত্রে চালিয়ে যেতে হবে। কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তরা যা দেওয়ার দিয়ে গেছেন। আমাদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। আমি আগেই বলেছি, প্রথম প্রজন্মের নেতাদের মধ্যে এখন একমাত্র কমরেড নীহার মুখার্জী জীবিত আছেন। মৃত্যুর সাথে দিনরাত লড়ছেন। বছরের পর বছর নিদারুণ কষ্ট সহ্য করছেন, বেঁচে থাকাটাও তাঁর সংগ্রাম, এবং সেটা করছেন শুধুমাত্র পার্টির জন্য। ডাক্তাররা তাঁর মানসিক শক্তি দেখে চমকে উঠছেন। এরকম কঠিন রোগজর্জরিত শরীর অথচ মনোবল ও চিন্তা-ভাবনা কত সুদৃঢ়। জীবনে একটিই সাধনা ও লক্ষ্য — পার্টিকে শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় মজবুত করা। আপনারা জানেন কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই না খাওয়ার দিনগুলোতে একমুঠো চাল সংগ্রহ করার জন্য, কমরেড শিবদাস ঘোষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, একটা আশ্রয় জোগাড় করার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী ঘুরেছেন। তখন থেকে লড়াই শুরু হয়েছে। এই দলটা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের পাশে থেকে তিনি যা কঠিন সংগ্রামী ভূমিকা নেওয়ার সেটা নিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের যে নেতারা ছিলেন, তাঁরাও একে একে বিদায় নিচ্ছেন। আমরা হচ্ছি তার পরের প্রজন্ম। প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা জানি, মৃত্যু অনিবার্য। শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, যতদিন বাঁচবে, মাথা উঁচু করে বাঁচবে, মৃত্যুও বরণ করবে মাথা উঁচু করে। যে সমস্ত নেতারা বিদায় নিয়েছেন তাঁরা সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সমস্ত স্তরে স্তরে নেতা-কর্মীরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড নীহার মুখার্জী যে আহ্বান জানাচ্ছেন, সেভাবে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন। এ ক্ষেত্রেই কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তের জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদের। এটা যদি নিতে পারি, এই সভায় আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যার যেখানে যা ত্রুটি ছিল, আপস ছিল চিন্তাভাবনার মধ্যে, যেখানে যা কিছু অনুন্নত মান ছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি নিয়ে যাই, তাহলেই একমাত্র এই স্মরণসভা, এই শোকজ্ঞাপনের তাৎপর্য। এ কথা বলেই কমরেড শীতেশ দাশগুপ্তকে আমি লাল সেলাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

দুয়ের পাতার পর

গণতান্ত্রিক শোষণমুক্তির চেতনার অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতে বাংলা ভাষা চাইনিজ (ম্যান্ডারিন), স্প্যানিশ ও ইংরেজির পরেই বিশ্বের চতুর্থ ভাষা। অথচ যে ভাষার জন্য এ জাতি রক্ত ঝরিয়েছে, সে ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও সৃজনশীল যত্নের অভাবে দিনে দিনে তার অন্তর্গত শক্তি হারাতে বসেছে। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সম্পদ আত্মীকরণের মাধ্যমে ভাষার কাঠামো শক্তিশালী করা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কাজটিও অবহেলিত হয়ে আছে। একইভাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার, তত্ত্ব, গবেষণা, সমাজবিজ্ঞান-দর্শনের সর্বশেষ চিন্তাধারাগুলোকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির কাজটিও দুর্বল। আজ বিলম্বে হলেও সময় এসেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি ও আমাদের ভাষা সংগ্রামের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে ভাষার সমৃদ্ধি সাধনের কাজটি জোরদার করার।

মহান ভাষা আন্দোলনের আরও একটি চেতনা আমাদের শাসকশ্রেণী উপেক্ষা করে চলেছে। সেটি হল ভাষার উপর গণমানুষের সর্বজনীন অধিকার। ভাষা মানুষের চিন্তার বাহন। ভাষা আধুনিক না হলে আধুনিক চিন্তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে পারে কিন্তু জ্ঞানজগতের সর্বশেষ অগ্রগতি, আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের সাথে পরিচয় কিংবা শিল্প-সাহিত্যসহ মানবকলার রস আস্বাদন করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। একইভাবে উন্নত চিন্তা করা এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দরকার। ভাষা আন্দোলনের প্রায় ৬০ বছর পার হয়েছে, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে — কিন্তু আজও দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ শিক্ষার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত, প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিতের সংখ্যা এর দ্বিগুণ। বিজ্ঞান, দর্শন বা সাহিত্যসহ মানুষের ভাবগত সম্পদের সাথে পরিচিত হওয়ার, রস গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। একুশের চেতনা এ বৈষম্য বিলোপের ও ভাষার ওপর সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বেগবান করার তাগিদও আমাদের দিয়ে যায়।

বস্তিতে একের পর এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কেন

মনে হচ্ছে বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে গেছে। ২০ বছর এই বস্তিতে আছি, সবে দু'মাস আগে ঘরটা নতুন করে বেঁধেছিনু, সব পুড়ে খাক হয়ে গেল। পাঁচ বাড়ি বাসন মাজি, দুপুরে ফিরে এসে দেখি আগুনে সব দাউ দাউ করে জ্বলছে। লোকজন বলছে, তোর ছেলে ঘরে আছে। পাগলের মতো লোকের পা ধরে শুধু কেঁদেছি, আমার ছেলেটো বোধ হয় আর নেই — এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল মিতা দেবনাথ। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে শ্মশান হয়ে যাওয়া উল্টোডাঙা বাসন্তী কলোনি বস্তির বাসিন্দা। সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা যখন এক এক করে বস্তির ঘরগুলো গ্রাস করছিল, আর সবাই প্রাণটা বাঁচাতে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় আতঙ্কে মিতা দেবনাথের ছ'বছরের ছেলে সদানন্দ ছুটে ঢুকে পড়েছিল তাদেরই ঝুপড়ি ঘরে। ঘরের মধ্যে ছেলেটা সিটিয়ে কাঁদছিল, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আর এক বস্তিবাসী কান্না শুনে কোনক্রমে সদানন্দের প্রাণ বাঁচিয়েছে। সারাদিনের পর ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে তার মা। কিন্তু বুকের জ্বালা এখনও নেভেনি। আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, গায়ের রক্ত জল করে কী কষ্টে যে ঘরটা বেঁধেছিনু সে আমিই জানি।

তিনটে ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে পোড়া ঝুপড়ি ঘরের ছাইয়ের পাশে বসে ছিল রানি খাঁ, একটা সাত মাসের বাচ্চা কোলে। মুখের চোয়াল বসে গেছে। বত্রিশ বছরের মহিলাটিকে দেখে মনে হল বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, অভাবের তাড়নায় বোধ হয় প্রতিদিন খাবারও জোটে না। জিজ্ঞেস করতে বলল, সব পুড়ে খাক হয়ে গেল। এখন শুধু বেঁচে আছি, ধুক ধুক করে। এর চেয়ে মরে গেলে ভাল হত। সব শেষ হয়ে যেতে দমকল এল। সামনের পুড়ে শ্মশান হয়ে যাওয়া ঘরের ছাইগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, পাশাপাশি থাকতুম, জলজ্যান্ত মানুষটা পুড়ে কাঠ হয়ে গেল। ঝুপড়ির বাসিন্দা ঠিকা শ্রমিক ৩০ বছরের শ্যামল সর্দার নিজের প্রাণটাও বাঁচাতে পারেনি। ঘুমের মধ্যেই ঝলসে গেছে। নিজের ছোট্ট ছিটেবেড়ার পোড়া ঘরের মধ্যেই পাওয়া গেছে তার পোড়া মৃতদেহ।

গত ১২ জানুয়ারি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে উল্টোডাঙার বাসন্তী কলোনীর প্রায় ১১০০ ঝুপড়ি। আর ঠিক তার আট দিনের মাথায় ২০ জানুয়ারি আর এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ট্যাংরার আর একটি বস্তি। সেখানেও ১৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তিলোত্তমা কলকাতা শহরের সবচেয়ে গরিব মানুষগুলো অসহায় ভাবে চোখের সামনে তাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ছাই হয়ে যেতে দেখল। বছরের শুরুতেই দু'দুটো ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কয়েক হাজার মানুষকে একেবারে নিঃস্ব করে দিল। এটা কি অনিবার্য ছিল? দমকল মন্ত্রী বলেছেন, 'বস্তিতে আগুন দ্রুতই ছড়ায়।' যেন তার কিছু করার নেই। পুলিশ কমিশনার বলেছেন, 'দমকলের গাড়ি সময়ে আসতে পারেনি। যেহেতু সিটুর অটোচালক ইউনিয়ন এবং তৃণমূলের অবরোধ চলছিল।' কিন্তু সকলেরই জানা আছে আগুন নেভানোর দমকল জরুরি পরিষেবা, ফলে প্রশাসন ইচ্ছে করলে দমকলের গাড়ি যাওয়ার পথ মুক্ত করতে পারত, কিন্তু তা করা হয়নি। ফলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, প্রশাসন সত্যিই আগুন নেভাতে আদৌ তৎপর ছিল কি? দমকল দেরিতে আসায় উল্টোডাঙায় উত্তেজিত জনতা একটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে, অভিযোগ তাতে পর্যাপ্ত জল ছিল না। বস্তিবাসীদের আরও অভিযোগ দমকল সময়মত এলে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটত না।

পুলিশ ও দমকল বাহিনী প্রাথমিক ভাবে মনে করছে 'রান্না করতে গিয়েই আগুন লেগেছে।' কিন্তু সত্যিই কি রান্নার আগুন থেকেই এতো বড় একটা বস্তির সর্বস্ব পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল? কীভাবে আগুন লেগেছিল তা জিজ্ঞাসা করায় বাসন্তী কলোনীর বস্তিবাসীদের কেউ কেউ বললেন, একটা ঘরে প্রথমে আগুন লেগেছিল, তারপর হু হু করে সারা বস্তিটায় ছড়িয়ে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি আগুন ছড়িয়ে যেতে কখনও দেখিনি। কেউ কেউ আবার মুখই খুলল না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা গেল 'যার ঘরে প্রথম আগুন ধরেছিল সে তো খুব মস্তিতে ঘুরছে।' এও শোনা গেল, যে ঘরে আগুন লেগেছিল, সেই ঘরে জিনিসপত্র তেমন ছিল না, ঘর ছিল ফাঁকা। ফরেনসিক ল্যাবরেটরির সহকারি অধিকর্তা জিতেন্দ্রনাথ পাল এবং এ সেনগুপ্তের কথায়— সিলিণ্ডার ফেটে আগুন সাধারণত এত ছড়ায় না। তাহলে প্রশ্ন হল এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এত বড় একটা বস্তি সম্পূর্ণ পুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পিছনের কারণ কী?

আশ্চর্যের বিষয়, এই ধরনের বস্তিতে একাধিক বার অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও তার কারণ প্রতিবারই রহস্যজনক থেকে যায়। এমনটাই অভিমত প্রকাশ করেছে বাসন্তী কলোনি ও ট্যাংরার পুড়ে যাওয়া বস্তির বাসিন্দাদের অনেকেই। বাসন্তী কলোনিতে এর আগে ২০০২ সালে আগুন লেগেছিল, ট্যাংরায় এই নিয়ে চারবার আগুন লাগল। কোনওবারই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ সরকার প্রকাশ করেনি। কেন? প্রশাসনের তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০৭ সালে হাওড়া ফুলবাজার অগ্নিকাণ্ড এবং ২০০৮-এ নন্দরাম মার্কেট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। হাওড়া ফুলবাজারে আগুন লাগার কয়েক বছর আগে থেকেই চলছিল ফুলবাজার ভেঙে বহুতল বাজার করার পরিকল্পনা।

নন্দরাম মার্কেটে আগুন লাগল। আগুন বেছে বেছে সেই দিকটাতেই লাগল যে দিকে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকান ছিল। সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল বাহিনীর তিনদিন লেগে গেল।

পুড়ে যাওয়া বাসন্তী কলোনী ভেঙে ফ্ল্যাট করার পরিকল্পনা যে চলছিল তা জানালেন বস্তিবাসীরাই। লক্ষণীয়, এই সব অগ্নিকাণ্ডের পিছনে একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুরোনো হাওড়া ফুল বাজার বা নন্দরাম মার্কেট হোক, কিংবা গরিব মানুষের আশ্রয় বাসন্তী কলোনী বস্তি হোক, সেখানে আগুন লাগার আগে থেকেই কিংবা ঘটনার ঠিক পরে পরেই বড় বড় ফ্ল্যাট, মাল্টিস্টোরড মার্কেট বা বিল্ডিং গড়ে তোলার একটা পরিকল্পনা কাজ করছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মুনাফার স্বার্থে গরীব মানুষকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রমোটার, বৃহৎ পুঁজির মালিক, প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিদের যৌথ চক্রান্ত কাজ করছে না তো!

পুঁজিবাদের সংকট শ্রমিকদের কতটা হীন করতে সাহায্য করে সেসম্পর্কে মহান মার্কস প্রায় দেড়শ বছর আগে দেখিয়েছেন, 'সঙ্কটের আবর্তে পড়ে মুনাফার জন্য পুঁজি দুটো রাস্তা নেয়। একটা হ'ল প্রতারণা-জোচ্চুরি-ঠকবাজির রাস্তা। ব্যক্তি মালিক অসৎ বলে শুধু নয়, সর্বোচ্চ মুনাফার অন্য পথ বন্ধ বলেই পুঁজি জুয়াচুরির পথে যায়। দ্বিতীয় পথ হ'ল, বিনিয়োগ-উৎপাদন-মুনাফা এই পথ ছেড়ে, পণ্য উৎপাদন না করে অন্য রাস্তায়, শেয়ারে ফাটকা বা জুয়াচুরির পথে টাকা দিয়ে টাকা ধরার রাস্তায় পুঁজিবাদ যায়।' যেটা বর্তমানে ঘটছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে অর্থনীতি। বাজারে চাহিদা নেই। ব্যবসাদার-মালিক-প্রমোটার পুঁজি ঢালছে আবাসন ব্যবসায়। বড় বড় ফ্ল্যাট, মনোরম পার্ক, শপিং মল — এসব করে মোটা টাকা লুটতে চাইছে। এজন্য জায়গা চাই। সে জায়গা কোথা থেকে আসবে? গরিব মানুষকে তাদের জমি থেকে, ভিটে থেকে, বাসস্থান থেকে উৎখাত করা ছাড়া।

তাছাড়া বড়লোকের ভোগবিলাসের জন্য এ শহরকে ঝাঁ চকচকে করার পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গরিব মানুষের একমাত্র আশ্রয় বস্তিগুলি। সুতরাং এরকম দু'চারটে বস্তি পুড়লই বা। তাতে কী এসে যায়! সর্বস্বান্ত মানুষগুলো তো আর ঘর বানাতে পারবে না। এই সুযোগে ওদের উৎখাত করা সহজ হবে। আর একান্ত যদি তা না হয়, কিছু রিলিফ দিয়ে মহানুভবতার অবতার সেজে শাসকদলগুলির নেতা-নেত্রীদের ভোট বৈতরণী পার হওয়া অন্ততঃ সহজ হবে। এমনটাই ধারণা ট্যাংরা, বাসন্তী কলোনির নিঃস্ব বস্তিবাসীদের।

তারা বলছে, শাসক ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক মন ভোলানো প্রতিশ্রুতি এসেছে। আমরা জানি, মাস দুয়েক পরেই পৌরসভা ভোট, ভোট চলে গেলে আমাদের দিকে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না।

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

বীরভূম জেলা এস ইউ সি আই (সি)-এর মুরারই লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড জাব্বার সেখ (৮০) বার্ধক্যজনিত রোগে গত ১৪ জানুয়ারি রূপরামপুর গ্রামের নিজ বাসগৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৬০-এর দশকের শেষের দিকে জননেতা কমরেড জিয়াদ আলি বক্সীর মাধ্যমে কমরেড জাব্বার সেখ মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে নিজেকে এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত করেন। নিরক্ষর, দরিদ্র, ভূমিহীন, খেতমজুর এই কমরেড ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন যোগ্য সংগঠক হিসেবে এলাকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিবার-পরিজন থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জন তাঁর কাছে দলের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সবসময় দলের কাজকে প্রাধান্য দিতেন। জীবিকা হিসেবে বিভিন্ন গ্রামে ফেরি করে মাছ বিক্রি করার সময়ে চাঁদা তুলতেন, গণদাবী বিক্রি করতেন, পার্টির কথা প্রচার করতেন। তিনি নিজের ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনদের পার্টির সাথে যুক্ত করে গেছেন।

২৭ জানুয়ারি বিকেলে রূপরামপুর বাসস্ট্যান্ডে তাঁর স্মরণসভা আয়োজিত হয়। স্মরণসভায় মুরারইয়ের কর্মী-সমর্থকরা এবং বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রতন মুখার্জী। সভায় জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড জাব্বার সেখ লাল সেলাম

চটকল চুক্তিতে সই করেনি অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি

একের পাতার পর

তৃতীয়ত, এই ধর্মঘটের দাবিপত্রে ছিল যে প্রতিটি নতুন শ্রমিককেই কাজের প্রথম দিন থেকে পিএফ এবং ইএসআই-এর সুবিধা আইন অনুযায়ী দেওয়া হোক। কিন্তু এই দাবিটিও মানা হল না।

চটশিল্পের শ্রমিকদের বকেয়া ডি এ-র পরিমাণ ছিল মাসে ৬২৭ পয়েন্ট অর্থাৎ ১১৯১ টাকা। দাবি ছিল এই টাকা শ্রমিকদের মজুরির অংশ। কিন্তু শ্রমিকদের এই দাবিটি ৬ কিস্তিতে তিন বছরে মালিকরা দেবে বলে চুক্তি হল। ফলে এটা সুষ্ঠু মীমাংসা হল না এবং এত দীর্ঘ কিস্তি হওয়ার ফলে শ্রমিকরা ঠিক ঠিক পাবে কি না তাতে প্রশ্নচিহ্নই থেকে গেল।

এছাড়া পুরনো বকেয়া হিসাবে প্রতিটি শ্রমিকের যে ৪০ হাজার টাকার মতো ডি এ পাওনা ছিল — সে ব্যাপারেও এই চুক্তি নীরব থেকে কার্যত এই পাওনাকে অস্বীকার করল। এই চুক্তিতে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের বকেয়া গ্র্যাচুইটির বিষয়েও কোনও ফয়সালা করল না। প্রতিটি মিলে প্রায় ১০-১৫ বছর যাবৎ অসংখ্য শ্রমিক গ্র্যাচুইটি না পেয়ে চরম বঞ্চনার মধ্যে রয়েছে।

এই সব কারণে আমরা এ আই ইউ টি ইউ সি মনে করি কিছু ইউনিয়ন স্বাক্ষরিত আজকের চুক্তিটি শ্রমিকদের আইনসঙ্গত অধিকার হরণকারী চুক্তি। ফলে এই চুক্তিতে আমরা স্বাক্ষর দিতে পারিনি। আমাদের সংগঠনের সাথে এ আই টি ইউ সি, বি এম এস, এ আই সি সি টি ইউ, আই এফ টি ইউ-ও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। কিন্তু শ্রমিক ঐক্যের স্বার্থ এবং শ্রমিকদের বাস্তব কঠিন পরিস্থিতির কথা মনে রেখে আমরাও ধর্মঘট তুলে নিচ্ছি এবং শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই চুক্তিতে সামিল হতে না পারার কারণ ধর্মঘটী শ্রমিকরা উপলব্ধি করবেন এবং বর্তমান ধর্মঘট থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে আরও সুসংহত ও উন্নত আন্দোলন গড়ে তুলবেন।''

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঃ বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিবাদ

শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি যে, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চলছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির কর্মী ও সমর্থকদের উপর চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হচ্ছে, প্রতিবাদী ও বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'পিপল্‌স মার্চ' পত্রিকার সম্পাদক প্রতিবাদী সাংবাদিক স্বপন দাশগুপ্তকে 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে কালা আইন ইউ এ পি এ প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার ও পুলিশি হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার যে সংবাদ প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তা থেকে রাজ্য সরকারের অত্যন্ত নিন্দনীয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংবাদপত্রে আরও প্রচারিত হয়েছে যে, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে ক্যান্সারে আক্রান্ত শ্রী দাশগুপ্তের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি শুধু নয়, তাঁর উপর বর্বর অত্যাচারও চালানো হয়েছে। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শ্রী দাশগুপ্ত এস এস কে এম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকারের এই জঘন্য কার্যকলাপের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং শ্রী দাশগুপ্তের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করছি।

বাঁকুড়া জেলার বারিকুলে প্রতিবাদী আদিবাসীদের মিছিলের উপর পুলিশের গুলি চালনায় দু'জন মহিলার ঘটনাস্থলে মৃত্যুর ঘটনাও আমরা প্রচারমাধ্যমে দেখেছি। আমরা মনে করি এই সমস্ত ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এ রাজ্যে কী নৃশংসভাবে জনগণের আন্দোলনগুলি দমন করা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পদদলিত করা হচ্ছে এই সব ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করছে।

আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষকে সামনে এগিয়ে এসে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি। তা না হলে এই অশুভশক্তি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে যার হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র-যুব সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষের বার্তা

(১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি তমলুকে অনুষ্ঠিত তৃণমূল ছাত্র-যুব সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষকে আমন্ত্রণ জানান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে না পেরে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিম্নের বার্তাটি পাঠান। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ঐ বার্তাটি উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে পড়ে শোনান।)

পরম প্রীতিভাজনেষু শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
রাজ্য সভাপতি, তৃণমূল যুব কংগ্রেস

সাথী,

তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র-যুব সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সে কারণে এই সম্মেলনে আমি উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য দুঃখিত। আপনারা সমগ্র দেশের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের এক ভয়াবহ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আপনাদের সংগঠনের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য মিলিত হয়েছেন এবং এ সম্পর্কে আমার কিছু সাজেশানস চেয়েছেন। উপস্থিত হতে না পেরে লিখিতভাবে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা জানাচ্ছি।

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক সর্ব দিক থেকেই আজ যে আমরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি — এ কথা বিবেকবান মানুষমাত্রই স্বীকার করবেন।

অনাহারে বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী-শিশুর মৃত্যু, কোটি কোটি বেকার-অর্ধবেকার-কর্মচ্যুত যুবকের অসহনীয় দুরবস্থা, ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধিজনিত সংকট, কাতারে কাতারে জমিচ্যুত কর্মহীন গ্রামীণ গরিবের কর্মসন্ধানে দেশ-বিদেশে পাগলের মতো ছুটে বেড়ানো, সহায়সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ মা-বোনের, এমনকী সাত-আট বছরের শিশুকন্যার দেহ বিক্রির বাজারে পণ্য হওয়া, দুঃসহ জ্বালায় হাজারে হাজারে গরিব মানুষের আত্মহত্যা করা, — দেশের এই নিদারুণ চিত্র দুঃখের, ব্যথার, অন্ধকারের। তাই প্রশ্ন জাগে, এই স্বাধীনতার জন্যই কি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়েছিলেন, শহিদরা আত্মবলিদান করেছিলেন? আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে দেশের এই দুর্গতি দেখে ছাত্র-যুবকদের কী করতে বলতেন?

ব্যক্তিগত স্বার্থে নিমজ্জিত তথাকথিত শিক্ষিতদের ধিক্কার জানিয়ে একদিন বিবেকানন্দ বলেছিলেন, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষালাভ ক'রে এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও যারা ওই দরিদ্রদের কথা একটিবার চিন্তা করার অবসর পায় না, তাদের আমি বিশ্বাসঘাতক বলি। যত দিন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অজ্ঞানে ডুবে থাকবে, ততদিন তাদের পয়সায় নিশ্চিন্ত থেকে অথচ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না — এমন প্রত্যেকটি লোককে আমি দেশদ্রোহী মনে করি। ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন, ‘‘অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারারুদ্ধ অথবা লাঞ্ছিত হয় — সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। .... স্কুলে-কলেজে, ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে-মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে, সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও। ....আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।’’ বিশ্বকবির অবিস্মরণীয় উক্তি ‘‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।’’ বিশেষভাবে স্মরণীয়। শেষ জীবনে সমাজ সভ্যতার সংকট দেখে গভীর উৎকণ্ঠায় তিনি বলেছিলেন, ‘‘নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।’’

কী পারিবারিক জীবনে কী সমাজ জীবনে যখনই দুর্যোগ নেমে আসে তখনই প্রয়োজন দেখা দেয় যৌবনের শক্তির দ্বারস্থ হওয়ার, যে যৌবন সংগ্রামী আদর্শে উদ্দীপ্ত, লোভ-লালসা-ভীরুতা মুক্ত, সাহসে-তেজে-বীরত্বে দৃপ্ত। এই যৌবনই যুগে যুগে অন্যায়-অত্যাচার-শোষণ-নির্যাতনের প্রতিকারে সর্বস্ব পণ করে লড়েছে, প্রগতির জয়যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু গভীর উদ্বেগের বিষয় এই সংগ্রামী যৌবনকেই আজ ধ্বংস করা হচ্ছে। একদিকে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ মনীষী এবং অসংখ্য শহিদের মহান গৌরবময় স্মৃতিকে সুপরিকল্পিতভাবে বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত করা হচ্ছে, অন্যদিকে মদ-জুয়া-সাট্টা-ক্যাবারে ড্যান্স, কুৎসিত যৌন সাহিত্য ও সিনেমার পঙ্কিল স্রোতে যৌবনকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, রুচিহীনতা ঘরে বাইরে সর্বত্র কুরে কুরে খাচ্ছে। বিবেক-মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ধূলায় লুণ্ঠিত। সমাজের এই সর্বগ্রাসী সংকট ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবনকেও গ্রাস করেছে। স্নেহ-মমতা নেই, দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা-শান্তি নেই, মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অপমানিত-লাঞ্ছিত, ঘরে বাইরে বিপন্ন নারীর আর্তনাদ। মনে পড়ে শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই সংকটের সূচনা লগ্নেই বলেছিলেন, মানুষের মরণ আমাকে ব্যথা দেয় না। কারণ আমি জানি মানুষ জন্মাইলেই একদিন না একদিন মরিবেই। কিন্তু ব্যথা পাই মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে হৃদয়হীন পশুতে পর্যবসিত করিয়াছে। আজ থেকে আশি বছর আগে অবিভক্ত বাংলার রংপুরে ছাত্র-যুব সম্মেলনের ভাষণে এই শরৎচন্দ্রই একটি অতি মূল্যবান বিশ্লেষণ রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি, তাও জনকয়েক ব্যবসাদারের হাতে। বণিকীবৃত্তিই মুখ্যত রাজনীতি। হয় স্বহস্তে করে, না হয় অপরকে দিয়ে করায়। শোষণের জন্যই শাসন।’’ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ‘‘আমার ছেলেবেলায় আমি ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সব চাইতে বড় কর্তব্য বলে মনে করতাম। পরে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, ব্রিটিশকে তাড়ালেই আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না। ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করার জন্য আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হবে।’’ আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ছাত্র হিসাবে এই পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের ঝাণ্ডাকেই বহন করে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সিপিএম দল কোনও দিনই যথার্থ মার্কসবাদী ছিল না। এদেশে চলতি কথায় আছে ‘গেরুয়া পরলেই সন্নাসী হয় না, মক্কা গেলেই হাজি হয় না, খদ্দর পরলেই স্বদেশি হয় না, চরিত্র দেখতে হয়।’ তেমনই লেনিনও বলেছিলেন, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আর মার্কসবাদ জিন্দাবাদ বললেই মার্কসবাদী হয় না, চরিত্র যাচাই করতে হয়।’ অতীতে ভোটের স্বার্থে সিপিএম যতটা বামপন্থার চর্চা করত, গদিতে বসে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাও জলাঞ্জলি দিয়েছে। তাই ১৯৭৭ সাল থেকে সরকারি ক্ষমতার বাইরে থাকা বামপন্থী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জনগণের নানা দাবিতে এই সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছে, আমাদের বহু কর্মীর বুকের রক্ত ঝরেছে, অনেকে খুন হয়েছেন, অনেকে কারারুদ্ধ হয়ে আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট জননেত্রী বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সেই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে সিপিএম সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সিপিএমের ক্রিমিনালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারপরও তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত সিপিএম বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থেই আলাদা দল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপর কয়েক বছর আমাদের দল মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেস গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্লামেন্টারি লক্ষ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় গণআন্দোলন চালিয়ে গেছে। যখন সিপিএম সরকার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের যথেচ্ছ শোষণ-লুণ্ঠনের জন্য কৃষিজমি ধ্বংস ও গরিব কৃষক-ভাগচাষি-খেতমজুরদের উৎখাত করতে শুরু করে দিল — এই আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন লড়াইয়ের স্বার্থে প্রথমে সিঙ্গুরে ও পরে নন্দীগ্রামে যথাক্রমে ‘সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’ ও ‘নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি’র মাধ্যমে আমরা উভয় দল স্থানীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ হই। এই আন্দোলন সিপিএম সরকারের পুলিশী বাহিনী ও দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। সিঙ্গুরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃষকদের উপর আক্রমণ, রাজকুমার ভুলকে খুন, তাপসী মালিককে ধর্ষণ ও খুন এবং সর্বোপরি নন্দীগ্রামে মার্চে ও নভেম্বরে সিপিএম সরকার কর্তৃক পুলিশ ও ক্রিমিনালদের দিয়ে সংগঠিতভাবে পর পর গণহত্যা ও গণধর্ষণ গণআন্দোলন দমনে সিপিএম সরকারের নগ্ন ফ্যাসিবাদী চরিত্র উদঘাটিত করে দিল। চতুর্দিকে যখন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নারী ধর্ষণ চলছে, তার প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য এবং গণআন্দোলনগুলিকে সিপিএম সরকারের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমাদের দল অনুভব করে যে তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এই উভয় দলের রাজ্য স্তরে আন্দোলনের কর্মসূচিভিত্তিক একটা ঐক্য হওয়া দরকার। আমরা আপনাদের দল তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব রাখি এবং আপনাদের নেতৃত্বও সাগ্রহে সাড়া দেন। আমাদের উভয় দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘোষণাকে পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সংগ্রামী জনগণ সানন্দে প্রবল সমর্থন জানায়।

এটা সকলেই জানেন, আমাদের দল পুঁজিবাদবিরোধী শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের উপর জোর দেয় এবং বিশ্বাস করে যে ভোটে নয় একমাত্র বিপ্লবের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির মৌলিক স্থায়ী সমাধান সম্ভব। একটি সৎ, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সরকার দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ প্রশাসন দিতে পারে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে কিছু রিলিফ দিতে পারে এবং অত্যাচারিত-শোষিত জনগণের প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে পুলিশের নৃশংস আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু সিপিএম সরকার এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিপরীত ভূমিকাই পালন করেছে— যার জন্য ওরা অতীতে আমাদের দলকে নির্বাচনে সিটের প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও আমরা ওদের সাথে যাইনি। বরং অনেক অত্যাচার-আক্রমণ সহ্য করেও জনগণের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে গেছি। এই গণআন্দোলনের স্বার্থেই আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। গত লোকসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রশ্নে আমাদের সাথে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে গণআন্দোলন দমনে ফ্যাসিবাদী আক্রমণকারী সিপিএমকে পরাস্ত করানোর বৃহত্তর স্বার্থে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্য রক্ষা করে গেছি। আমাদের দলের নীতি আদর্শ বজায় রেখে গণআন্দোলনের স্বার্থে ও সিপিএমকে পরাস্ত করার প্রয়োজনে আগামী দিনেও আমাদের উভয় দলের এই ঐক্য রক্ষা করে যেতে চাই।

সাম্প্রতিক কালে গণআন্দোলনের স্বার্থে আমাদের উভয় দলের বৈঠকে, সম্মিলিত কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী, অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের প্রতি যে আবেগ, আস্থা, আন্তরিকতা ও সৌজন্য প্রকাশ করেছেন, সেটা আমাদের দলের নেতা কর্মীরা আবেগের সাথে স্মরণ করে।

অবিভক্ত মেদিনীপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্যময় তমলুকে আজ আপনারা এই সম্মেলন করছেন। এই মেদিনীপুরেই জন্মেছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের ঊষালগ্নে রামমোহনের সার্থক উত্তরসূরি উদিতসূর্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যিনি সেই দিন মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক মানবতাবাদের ঝাণ্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সুমহান চরিত্র, জ্ঞানের সাধনা, তেজ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, হৃদয়বৃত্তি একদিন এদেশে ঘরে ঘরে আরাধ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ বন্দিত ‘অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের’ অধিকারী এই বিদ্যাসাগরই একদিন বলেছিলেন, দেশের লোক অনাহারে মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর ভগবান ভগবান করব, এমন ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই। আমি স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারবার যেন জন্ম নিই এই মর্ত্য বাংলায়।

আর এই জেলায় জন্মেছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লববাদের মহান যোদ্ধা প্রথম শহীদ কিশোর ক্ষুদিরাম। এই তমলুক শহর একদিন তাঁর বিপ্লবী কর্মযজ্ঞের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল। তাঁর অকথিত আবেদন একদিন অজানা এক চারণকবির কণ্ঠে রূপ পেয়েছিল, যে আবেদন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলায় জেলায়, ভিন্ন রাজ্যে অসংখ্য ক্ষুদিরাম হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়েছিল। আগস্ট বিপ্লবে গুলিবিদ্ধ কৃষক রমণী মাতঙ্গিনী হাজরার রক্তাক্ত দেহও এই তমলুক শহরের কোর্ট প্রাঙ্গণে ভূপতিত হয়েছিল। আশা করি এঁদের স্মৃতিকে বুকে বহন করে আপনারা আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। আপনাদের সম্মেলনে আগত সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

শুভেচ্ছান্তে
প্রভাস ঘোষ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষে
অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে
মহিলা সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল
৮ মার্চ ২০১০
রামলীলা ময়দান, দিল্লি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in